হুমায়ূন আহমেদ

অঁহক

সায়েন্স ফিকশান
গল্পমালা

lexif

অঁহক

ইন্টার গ্যালাকটিক স্পেসশিপগুলির পরিচালনা নীতিমালায় তিনটি না-সূচক সাবধান বাণী আছে। স্পেসশিপের ক্যাপ্টেনকে এই তিন 'না' মেনে চলতে হবে।

১. স্পেসশিপ কখনো নিউট্রন স্টারের বলয়ের ভেতর দিয়ে যাবে না।

২. ব্ল্যাকহোলের বলয়ের ভিতর দিয়ে যাবে না।

৩. অঁহক গোষ্ঠীর সীমানার কাছাকাছি যাবে না। ভুলক্রমে যদি চলে যায় অতি দ্রুত বের হয়ে আসবে।

সমস্যা হল নিউট্রন স্টার এবং ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব আগেভাগে টের পাওয়া যায়। সময় মতো ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু অঁহকদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগেভাগে তাদের উপস্থিতি জানার কোন উপায় নেই।

অথচ অঁহকরা মহাশূন্যের বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে সবচে' দয়ালু। বিপদগ্রস্ত মহাশূন্যযানের সাহায্যের জন্যে অতি ব্যস্ত। তাদের কর্মক্ষমতাও অসাধারণ। যে কোন যন্ত্রাংশ তারা অতি দ্রুত ঠিক করতে পারে। এই অনন্ত মহাবিশ্বের যে কোন শ্রেণীর প্রাণীর যে কোন ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ ঠিক করে ফেলতে পারে। তারপরেও এদের কাছে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এদেরকে ব্ল্যাকহোল কিংবা নিউট্রন স্টারের মতই বিপজ্জনক ভাবা হয়।

অঁহকদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ কোন তথ্য কোথাও নেই। গ্যালাকটো-পিডিয়াতে লেখা আছে—

অঁহক

অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রাণী। ছোট ছোট দলে এরা অনন্ত মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায়। অসংখ্য বাহু বিশিষ্ট প্রাণী। এদের খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি অজ্ঞাত। ধারণা করা হয় এরা খাদ্য গ্রহণ করে না। মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে এরা প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে। অন্য সব বুদ্ধিমান প্রাণীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চায়। তবে বিপদগ্রস্ত প্রাণীদের সাহায্যে অতি দ্রুত ছুটে আসে। ভগ্ন যন্ত্রাংশ ঠিক করা এবং আহত প্রাণীদের চিকিৎসায় এদের দক্ষতা সীমাহীন।

অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীদের কাছাকাছি এলে এরা নিজেদের অদৃশ্য রাখতে পছন্দ করে। এই ক্ষমতা তাদের আছে। তারা টেলিপ্যাথিক মাধ্যমেও বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। আহত বুদ্ধিমান প্রাণীদের চিকিৎসা দান কালে তারা এই ক্ষমতা ব্যবহার করে আহতের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেয়। তবে নিজেদের সম্পর্কে কিছুই বলে না।

তাদের যান্ত্রিক কোন কিছু নেই। কারণ তাদের যন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। মহাকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তারা ছোটাছুটি করতে পারে।

ধারণা করা হচ্ছে অঁহকরা অতি শান্তি প্রিয়। সিরাস নক্ষত্রের গ্রহ 'ভি থ্রি'র অতি উন্নত প্রাণী মায়রাদের একটি দল একবার অঁহকদের লক্ষ্য করে আণবিক ব্লাস্টার, লেজার-নিও ব্লাস্টার এবং পজিট্রন ব্লাস্টার নিক্ষেপ করে। সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার মতো অবস্থা তৈরি হয়। এর উত্তরে অঁহকরা তাদের যাত্রাপথ থেকে সরে যায় এবং তাদের কাছে একটি বার্তা পাঠায়। বার্তায় বলা হয়—

ধ্বংসে আনন্দ নেই।

আনন্দ সৃষ্টিতে।

অঁহকদের মোট সংখ্যা, তাদের জীবনকাল কিংবা বাসস্থান সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। খুব সম্ভব তাদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই। তাদের শরীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া এবং জৈব রসায়ন বিষয়ক কোন কিছুই জানা যায় নি। স্পেকট্রোগ্রাফিতে প্রাপ্ত সামান্য তথ্যে অনুমান করা হয় তারা মেঘ সদৃশ প্রাণী। তাদের বলয় থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে গামা রশ্মি এবং এক্স রশ্মির বিকিরণ হয়। এই বিকিরণ অনিয়মিত বলেই তাদের উপস্থিতি আগেই বোঝা যায় না।

গ্যালাকটোপিডিয়াতে অঁহকদের সম্পর্কে খারাপ কিছু নেই। মহাবিশ্বের অন্যসব বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গেই তাদের যুক্ত করা হয়েছে। তবে তাদের স্থান হয়েছে রেড বুকে। রেড বুকে নাম ওঠার অর্থ এদের কাছে যাওয়া অতি বিপজ্জনক।

স্পেসশিপ 'লি-২০১' একটি সাধারণ ফেরি শিপ। এর কাজ সৌরমণ্ডলের ভেতরের গ্রহ এবং উপগ্রহ থেকে খনিজ দ্রব্য মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যাওয়া; খনিজ দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির সব বড় বড় কল-কারখানাই মঙ্গল গ্রহে করা হয়েছে।

স্পেসশিপ লি-২০১-এর মাল বহনের ক্ষমতা অসাধারণ। এর ইঞ্জিন ইলেকট্রন এমিশন ইঞ্জিন। পুরনো ধরনের ইঞ্জিন হলেও ভারি ইঞ্জিন এবং কার্যকর ইঞ্জিন। সাধারণত .2c (c আলোর গতিবেগ) গতিতে চলে। প্রয়োজনে এই গতিবেগ বাড়িয়ে .6c পর্যন্ত যাওয়া যায়।

লি সিরিজের স্পেসশিপ পরিচালনার জন্যে কোন মহাকাশ নাবিকের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ এনারবিক রোবট কম্পিউটারের সাহায্যে এই কাজ সুন্দরভাবে করতে পারে।

তবে লি সিরিজের দু'শর উপরের নাম্বার শিপে অবশ্যই একজন মহাকাশ নাবিক লাগে। কারণ এই সিরিজ তৈরি করা হয়েছিল মিক্কিওয়ে গ্যালিয়াম ভেতরের মাইনিং-এর জন্যে। ইলেকট্রন এমিশন টেকনোলজি ছাড়াও এই জাতীয় মহাকাশযানে হাইপার স্পেস জাম্পের ব্যবস্থা আছে। দু'শ সিরিজের এটি দ্বিতীয় মহাশূন্যযান। প্রথমটি লি-২০০ মহাশূন্যে বিধ্বস্ত হয়েছিল। বিধ্বস্ত হবার

==========

কোন কারণ জানা যায় নি। ধারণা করা হয় কোন বিচিত্র কারণে মহাশূন্যযানটি হাইপার স্পেসে জাম্প দেয়। সেট কোঅর্ডিনেট না থাকায় সেটা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যায়।

এক হাজার টন গ্যালিয়াম ধাতু নিয়ে মহাকাশযান লি ২০১ বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ থেকে মঙ্গলের দিকে রওনা হয়েছে। কনট্রোল প্যানেলে যে বসে আছে তার নাম নিম। বয়স মাত্র ২৭। মেয়েটি তিন মাস আগে মহাকাশ যান পরিচালনার সার্টিফিকেট পেয়েছে। তবে ট্রেনিং পিরিয়ড এখনো শেষ হয় নি। তাকে এক হাজার ঘণ্টার একা ফ্লাইং টাইম সংগ্রহ করতে হবে। নিম এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে দু'শ একুশ ঘণ্টা। আজকের ফ্লাইট শেষ হলে আরো এগারো ঘণ্টা যুক্ত হবে।

নিমের চোখ কনট্রোল প্যানেলের দিকে। তাকিয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। অটো পাইলট এ দেয়া আছে। আর মাত্র আটত্রিশ মিনিট এগারো সেকেন্ডে সে পৌঁছে যাবে মঙ্গলের উপগ্রহ ডিমোসের পাশে। ফিক্সড অরবিট নিয়ে অপেক্ষা করবে মঙ্গল অবতরণ অনুমতির জন্যে। সেখানেও কিছু করতে হবে না। সবই অটো পদ্ধতিতে হবে। এই কাজের জন্যে মহাকাশ নাবিকের প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানের একজন এনারবিক রোবটই যথেষ্ট। নিমের পাশের আসনে যে রোবটটি বসে আছে সে সাধারণ মানের নয়। যে কোন মহাকাশযান সে চালাতে পারে। অতি আধুনিক হাইপার ডাইভার চালনার দক্ষতাও তার আছে। এই এনারোবিক রোবটের নাম দৃস। এরা S^2 টাইপ রোবট বলেই তাদেরকে মানুষের মতো আলাদা আলাদা নাম দিয়ে সম্মান দেখানো হয়।

দৃস নিমের দিকে তাকিয়ে বিনীত গলায় বলল, মিস ক্যাপ্টেন আমি কি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি ?

নিম বলল, নিশ্চয়ই পার।

দৃস বলল, আপনি কি কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ করছেন ?

অস্বাভাবিকতাটা কী ধরনের ?

আমাদের এই মহাকাশযানের গতি .2c থাকার কথা। প্রোগ্রাম সে রকমই করা হয়েছে। আপনার কি মনে হয় না গতি বাড়ছে ?

নিম বিরক্ত গলায় বলল, সে রকম মনে হয় না। পর্দার দিকে তাকিয়ে দেখ গতি দেখানো আছে।

দৃস বলল, আপনি কি দয়া করে ভিউ ফাইন্ডারের দিকে তাকাবেন। যে কোন দুটি উজ্জ্বল তারার দিকে তাকালেই লক্ষ করবেন আমাদের মহাকাশ যানের গতি .4c র কাছাকাছি।

এটা হতেই পারে না।

==========

আপনি ঠিকই বলেছেন এটা হতে পারে না। কিন্তু ফুয়েল কনজামশান রেটের দিকে তাকালে আপনি দেখবেন আমি যা বলছি তা ঠিক।

নিম অতি দ্রুত কয়েকটি রিডিং নিল। রিডিং থেকে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। ফুয়েল কনজামশান রিডিং .4c গতিবেগের কথাই বলে। কিন্তু এই গতিবেগে কনট্রোল প্যানেলে লালবাতি জ্বলবে। হাইপার ডাইভ প্রক্রিয়া কার্যকর হবে।

দৃস বলল, ম্যাডাম আপনি ভীত হবেন না।

নিম বলল, আমি ভীত তোমাকে কে বলল ?

দৃস বলল, মহাকাশযানের গতি এখন .5c, ভীত হবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেই আমি আপনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ভীত না হবার জন্যে বলছি।

নিম মঙ্গলের স্পেসশিপ মনিটারিং সেলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। যোগাযোগ করা গেল না। দৃস বলল, ম্যাডাম কোনো মহাকাশযানের গতিবেগ যদি .5c-র চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

এই তথ্য আমি জানি।

আপনি যদি জানেন তাহলে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন কেন ?

তুমি আমাকে কী করতে বলছ ?

আমি আপনাকে ভীত না হবার জন্যে বলছি।

একটু আগেই তুমি বলেছ ভীত হবার মতো ঘটনা ঘটেছে।

দৃস বলল, আমার ধারণা যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সে সমস্যা আপনার ট্রেনিং-এর অংশ।

নিম বলল, তার মানে কী ?

ট্রেইনি নাবিকদের জন্যে মাঝে মাঝে পরিকল্পিতভাবে সমস্যা তৈরি করা হয়। দেখার জন্যে এরা সমস্যার সমাধান কীভাবে করে।

তোমার এ রকম মনে হচ্ছে ?

আমি সম্ভাবনার কথা বলছি। নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

এই সমস্যাটি ট্রেনিং-এর অংশ তার সম্ভাবনা কত ?

.30।

বল কী এত কতো সম্ভাবনা ?

ত্রিশ পারসেন্ট সম্ভাবনা কম না, মিস ক্যাপ্টেন।

৭০ পারসেন্ট সম্ভাবনা যে এটা বাস্তব সমস্যা ?

আপনি যথার্থ বলেছেন। মহাকাশযানের গতিবেগ বেড়েই চলেছে। ট্রেনিং-এর সময়েও গতিবেগ এত বাড়ানো হয় না। তাছাড়া এটা মাল বোঝাই ফেরি শিপ।

==========

এখন করণীয় কী ?

আপনি খুব ভাল করেই জানেন এখন করণীয়।

তারপরেও তুমি আমাকে সাহায্য করো।

আপনি যদি কূলকিনারা না পান তাহলে ইমার্জেন্সি ব্লু বাটন টিপবেন। ইমার্জেন্সি বাটন টেপার পর আপনার কিছুই করার থাকবে না। কম্পিউটার মিডিসি আপনার হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। ছোট্ট সমস্যা কিন্তু থেকেই যাবে মিস ক্যাপ্টেন।

সমস্যা কী ?

যে সব ট্রেইনি নাবিক ব্লু বাটন টেপে তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। তারা আর কখনো আকাশে উড়তে পারবে না।

আমার কী করা উচিত ?

আপনার ইমার্জেন্সি বাটন টেপা উচিত।

নিম ইমার্জেন্সি বাটনে চাপ দিল। প্যানেলে সবুজ আলো জ্বলে উঠল। কম্পিউটার মিডিসির ধাতব গলা শোনা গেল।

কম্পিউটার মিডিসি বলছি। আমি মহাকাশযানের কম্পিউটারের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। আমরা ক্রমবর্ধমান গতিতে এগুচ্ছি। অতি দ্রুত ত্বরণ বন্ধ করা প্রয়োজন। সেটা করা যাচ্ছে না। আয়ন ইঞ্জিনের যে ত্রুটি ধরতে পেরেছি সেই ত্রুটি সারানো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।

নিম বলল, ত্রুটি কেন দেখা গেল ?

এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না। হাতে সময় নেই।

তুমি এখন কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ ?

কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। খুব অল্প সময়েই এই মহাকাশযান বিধ্বস্ত হবে। কারণ এটি একটি মাল বোঝাই কার্গো। .6c-র গতিবেগ এ নিতে পারবে না।

আমাদের হাতে কত সময় আছে ?

তিন মিনিটেরও কম।

আমার কি কিছু করণীয় আছে ?

না। আপনি পেন্টাথেল থ্রি ইনজেকশন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। মৃত্যু হবে ঘুমের মধ্যে।

নিম ঠাণ্ডা গলায় বলল, অতি সুন্দর প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ।

নিমের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ হল। ভয়াবহ বিস্ফোরণ।

অঁহকদের ছোট্ট একটা দল দ্রুত কাজ করছে। তাদের কাজ যিনি তদারক করছেন তাকে তারা মহান শিক্ষক নামে ডাকছে। কাজের প্রতিটি পর্যায়ে তারা

==========

মহান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছে। এমনও হচ্ছে এক সঙ্গে সবাই কথা বলছে। মহান শিক্ষক একই সঙ্গে সবার কথার জবাব দিচ্ছেন।

মহান শিক্ষক বললেন, তোমরা কি আনন্দ পাচ্ছ ?

একসঙ্গে সবাই বলল, আমরা খুবই আনন্দ পাচ্ছি।

আমরা কেন বেঁচে আছি ?

আনন্দের জন্যে বেঁচে আছি।

আমরা কেন বেঁচে থাকব ?

আনন্দের জন্যে বেঁচে থাকব।

মৃত্যু কী ?

আনন্দের সমাপ্তি।

তোমরা যে মেয়েটির শরীরবৃত্তিয় ক্ষতি ঠিকঠাক করছ সে কোন্ সম্প্রদায়ের তা কি জানো ?

জানি মহান শিক্ষক। সে মানবসম্প্রদায়ের।

মানবসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য কী ?

বৈশিষ্ট্যহীন একটি সম্প্রদায়। যাদের শরীরবৃত্তিয় কর্মকাণ্ড অতি দুর্বল।

দুর্বল বলছ কেন ?

এরা অক্সিজেন নির্ভর একটি প্রাণী। অক্সিজেন একটি ভারি গ্যাস। ভারি গ্যাস নির্ভর প্রাণী দুর্বল হয়। হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম নির্ভর প্রাণীরা সত্যিকার অর্থেই বুদ্ধিমান। যেমন আমরা হাইড্রোজেন নির্ভর।

এর বাইরে কী আছে ?

এরা অতি নিম্ন শ্রেণীর বুদ্ধিহীন প্রাণীদের মতোই খাদ্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। কাজেই তারা চিন্তা বা শিক্ষার সময় পায় না। তারা তাদের সময়ের একটি বড় অংশ ব্যয় করে খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য পরিপাক এবং খাদ্য বর্জনে।

ভাল বলেছ, এদের আর কী ত্রুটি আছে ?

এদের সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা। এরা আমাদের মতো যন্ত্রমুক্ত না। মহান শিক্ষক আপনি বলেছেন যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা নিম্নমানের সভ্যতা।

যে কোন বস্তুর উপর নির্ভর সভ্যতাই নিম্ন সভ্যতা। এই সত্যটি সব সময় মনে রাখবে।

মহান শিক্ষক আমরা মনে রাখব।

তোমাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বলো।

মেয়েটি যে যন্ত্রযানে করে এসেছে সেটি সম্পূর্ণ ঠিক করা হয়েছে। যন্ত্রযানের মূল ডিজাইনে একটি ত্রুটি ছিল। আমরা সেই ত্রুটিও ঠিক করে দিয়েছি।

==========

কাজটা করে কি আনন্দ পেয়েছ ?

মহান শিক্ষক খুবই আনন্দ পেয়েছি।

মেয়েটির অবস্থা কী ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। মেয়েটির শরীরের যে অংশ অক্সিজেনবাহী তরল পরিশুদ্ধ করে সেই অংশই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সামান্য বেশি সময় আমরা নিয়েছি। তার জন্যে আমরা দুঃখিত মহান শিক্ষক।

কাজটা করে কি তোমরা আনন্দ পেয়েছ ?

আমরা অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। এখন আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি।

কী নির্দেশ ?

মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পাবার পর যেন অত্যন্ত আনন্দ পায় তার জন্যে কিছু কি করব ? তার শরীরের কিছু পরিবর্তন ? তার জন্যে মঙ্গলময় হয় এমন কিছু পরিবর্তন ?

অবশ্যই করবে। আমরা উপকারী সম্প্রদায়। আমাদের কাজ দুর্বল সম্প্রদায়ের উপকার করা। তাদের ত্রুটি দূর করা। অতি দুর্বল বুদ্ধিমত্তার প্রাণীরা নিজেদের ত্রুটি ধরতে পারে না। মেয়েটির কোন্ কোন্ ত্রুটি সারাবার কথা ভাবছ ?

সে মহাকাশযান চালক। মাত্র দু'টি হাতে এই জটিল মহাকাশযানের সমস্ত বোতাম এবং চক্রের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আমরা তাকে আরো বাড়তি দুটা হাত দিতে চাচ্ছি।

অতি উত্তম প্রস্তাব। দাও।

হাতের আঙুলের সংখ্যা পাঁচটির জায়গায় দশটি করে করতে চাচ্ছি।

এটিও ভাল প্রস্তাব। করে দাও।

মানবসম্প্রদায়ের পেছনে কোন চোখ নেই। পেছনে চোখ না থাকার কারণে সে পেছনে দেখতে পারে না। পেছনে দেখার জন্যে তাকে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে হয়। আমরা ভাবছি তার পেছনে একটি চোখ দিয়ে দেব।

জায়গাটা ঠিক করেছ ?

ঘাড়ে দিতে চাচ্ছি।

দাও ঘাড়েই দাও। তবে ঘাড়ে একটি চোখ না দিয়ে দু'টা চোখ দাও। মানবসম্প্রদায় সব সময় দু'টা চোখ ব্যবহার করে এসেছে। সেখানে হঠাৎ করে পেছনে একটা চোখ তার পছন্দ নাও হতে পারে।

ঠিক আছে মহান শিক্ষক, আমরা পেছনেও দু'টা চোখ দিয়ে দেব।

আর কিছু কী ভাবছ ?

আপনার অনুমতি পেলে আরেকটি ছোট্ট পরিবর্তন করা যায়।

বলো কী পরিবর্তন ?

মানবসম্প্রদায়ের গায়ের চামড়া সবচে' দুর্বল। আমরা কি একটি ধাতব আবরণ দিয়ে দেব।

না। তার প্রয়োজন দেখি না। চামড়া দুর্বল হলেও সে স্পেস স্যুট পরে। এটি যথেষ্ট মজবুত। গায়ের চামড়া ছাড়া বাকি পরিবর্তনগুলি করে দাও।

মহান শিক্ষক।

বলো।

মেয়েটি যখন তার শরীরের পরিবর্তনগুলি দেখবে তখন সে খুবই আনন্দ পাবে।

অবশ্যই আনন্দ পাবে।

মেয়েটির আনন্দের কথা ভেবেই আমাদের আনন্দ হচ্ছে।

আনন্দ মানেই বেঁচে থাকা। আমরা বেঁচে আছি। তোমাদের সবার কাজে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

ধন্যবাদ মহান শিক্ষক।

নিমের মহাকাশযান মঙ্গল গ্রহের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার জ্ঞান ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে। সে হতভম্ব হয়ে তার চারটি হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে দৃস।

নিম চোখ তুলে ছায়ার দিকে তাকাল।

দৃস বলল, মিস ক্যাপ্টেন আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ভয়ংকর অঁহকদের হাতে পড়েছিলাম।

নিমের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে এখনো জানে না তার ঘাড়েও দুটা চোখ আছে। সেই চোখ দিয়েও পানি পড়ছে।

দৃস বলল, মিস ক্যাপ্টেন কাঁদবেন না। আপনার জন্যে একটি ভাল সংবাদ আছে।

নিম ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ভাল সংবাদটি কী ?

দৃস বলল, আপনার ঘাড়ে যে দু'টি চোখ আছে, সেই চোখ দু'টা আসল চোখের চেয়েও অনেক অনেক সুন্দর।

জাদুকর

==========

আজ হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার অংক খাতা দিয়েছে।

বাবলু পেয়েছে সাড়ে আট। শুধু তাই নয়, খাতার উপর লাল পেনসিল দিয়ে ধীরেন স্যার বড় বড় করে লিখে দিয়েছেন, 'গরু'। কী সর্বনাশ !

বাবলু খাতা উল্টে রাখল। যাতে 'গরু' লেখাটা কারো চোখে না পড়ে। কিন্তু ধীরেন স্যার মেঘস্বরে বললেন, 'এই, বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়া।'

বাবুল বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়াল।

'তোর অংক খাতায় কী লিখে দিয়েছি সবাইকে দেখা।'

সে মুখ কালো করে সবাইকে দেখাল খাতাটা। ফার্স্ট বেঞ্চে বসা কয়েকজন ভ্যাকভ্যাক করে হেসে ফেলল। ধীরেন স্যার গর্জন করে উঠলেন। 'এ্যাই, কে হাসে ! মুখ সেলাই করে দেব।'

হাসি বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ধীরেন স্যারকে সবাই যমের মতো ভয় করে। আড়ালে ডাকে 'যম স্যার'। ফার্স্ট বেঞ্চে আবার একটু খিকখিক শব্দ হল। ধীরেন স্যার হুংকার দিয়ে উঠলেন। 'আরেকবার হাসির শব্দ শুনলে চড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব। নাট্যশালা নাকি ? এ্যাঁ ?'

ক্লাস পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে গেল। ধীরেন স্যার থমথমে গলায় বললেন, 'এ্যাই বাবলু, তুই ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকবি।'

বাবলু উদাস চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। বেঞ্চির উপর এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা তেমন কিছু না। কিন্তু বাসায় ফিরে বাবাকে কী বলবে এই ভেবেই বাবলুর গায়ে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। বাবা মোটেই সহজ পাত্র নন। ধীরেন স্যারের মতো মাস্টারও তাঁর কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু। বাড়িতে আজ ভূমিকম্প হয়ে যাবে, বলাই বাহুল্য। বাবলু এই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও কুলকুল করে ঘামতে লাগল।

বাবলু ভেবে পেল না অংকের মতো একটা ভয়াবহ জিনিস কী করে পড়াশুনার মধ্যে ঢুকে গেল। কী হয় অংক শিখে ? তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে বাঁদরের উঠবার দরকারটা কী ? আচ্ছা ঠিক আছে, উঠছে উঠে পড়ুক। কিন্তু প্রথম মিনিটে উঠে দ্বিতীয় মিনিটে আবার পিছলে পড়বার প্রয়োজনটা কী ? বাবলু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

স্কুল ছুটি হল পাঁচটায়। বাবলু বাড়ি না গিয়ে স্কুলের বারান্দায় মুখ কালো করে বসে রইল। স্কুলের দপ্তরি আনিস মিয়া বলল, 'বাড়িত যাও ছোট ভাই।'

বাবলু বলল, 'আমি আজকে এইখানেই থাকব।'

'কও কী ভাই ! বিষয় কী ?'

'বিষয় কিছু না। তুমি ভাগো।'

আনিস মিয়া একগাল হেসে বলল, 'পরীক্ষায় ফেইল করছ, কেমুন ? বাড়িত থাইক্যা নিতে না আসলে যাইতা না। ঠিক না ?'

আনিস মিয়া দাঁত বের করে হাসতে লাগল। বাবলু স্কুল থেকে ছুটে বাইরে চলে আসল। সরকার বাড়ির জামগাছের নিচে বসে রইল একা একা।

জায়গাটা অসম্ভব নির্জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। বাবলুকে ভয় দেখানোর জন্যেই হয়ত অসংখ্য ঝিঁঝি এক সঙ্গে ডাকতে লাগল। বিলের দিক থেকে শব্দ আসতে লাগল, 'হুঅ হুঅ'। ডানপাশের ঝোপ কেমন যেন নড়ে উঠল। বাবলু শার্টের লম্বা হাতায় ঘনঘন চোখ মুছতে লাগল।

'এই ছেলে, কাঁদছ কেন ?'

অন্ধকারে ঠিক পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। বাবলুর মনে হল লম্বামত একজন লোক ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির হাতে ভারি একটা ব্যাগ জাতীয় কিছু। পিঠেও এরকম একটা বোঁচকা ফিতা দিয়ে বাঁধা।

'এই খোকা, কী হয়েছে ?'

বাবলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি অংকে সাড়ে আট পেয়েছি।'

'তাই নাকি ?'

'জ্বি। আর ধীরেন স্যার আমার খাতার উপর লিখেছেন—গরু।'

বাবলু খাতাটা বের করে লোকটির দিকে এগিয়ে দিল। লোকটি এগিয়ে এসে খাতাটি নিল। সে বেশ লম্বা। এই অন্ধকারেও প্রকাণ্ড বড় একটা চশমা পরা থাকায় প্রায় সমস্তটা মুখ ঢাকা পড়ে আছে।

লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, 'খাতার উপর গরু লেখাটা অন্যায় হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তির উপর সরাসরি কটাক্ষ করা হয়েছে। তার উপর এত বড় বড় করে লেখার প্রয়োজনই বা কী ? ছোট করে লিখলেই হত।'

বাবলু শব্দ করে কেঁদে উঠল।

'উহুঁ, কাঁদবে না। কাঁদার সময় নয়। কী করা যায় এখন তাই নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে।'

বাবলু ধরা গলায় বলল, 'আমি স্কুলেও যাব না। বাসায়ও ফিরে যাব না। বাকি জীবনটা জামগাছের নিচে বসে কাটাব। না, জাহাজের খালাসি হয়ে বিলাত চলে যাব।'

'বুদ্ধিটা মন্দ না। কিন্তু চট করে কিছু-একটা করা ঠিক হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। তোমার নাম তো জানা হল না।'

'আমার নাম বাবলু। ক্লাস সেভেনে পড়ি। আপনি কে ?'

'ইয়ে আমার নাম হল গিয়ে হইয়েৎসুঁন।'

'কী বললেন ?'

'আমার নামটা একটু অদ্ভুত, আমি বিদেশী কি না !'

'কী করেন আপনি ?'

'আমি একজন পর্যটক। আমি ঘুরে বেড়াই।'

বাবলু কৌতূহলী হয়ে বলল, 'আপনার দেশ কোথায় ?'

'আসো, তোমাকে দেখাচ্ছি।'

হইয়েৎসুঁন আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'ঐ যে দেখছ ছায়া ছায়া, ওইটা হচ্ছে ছায়াপথ। মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি। স্প্রিংয়ের মতো। এর মাঝামাঝি একটি সৌরমণ্ডল আছে। আমরা তাকে বলি 'নয়ুঁততিনি' তার ন'নম্বর গ্রহটিতে আমি থাকতাম।'

বাবলু একটু সরে বসল। পাগল নাকি লোকটা ! কথা বলছে দিব্যি ভাল মানুষের মতো।

'বুঝলে বাবলু, বলতে গেলে আমরা বেশ কাছাকাছি থাকি। পৃথিবীও কিন্তু মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে পড়েছে। হা হা হা।'

'আপনারাও বুঝি বাংলায় কথা বলেন ?'

'উঁহু। তোমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছি কারণ আমার সঙ্গে একটি অনুবাদক যন্ত্র আছে।'

সে ইশারা করে গোলাকৃতি একটি বাক্স দেখাল। বাক্সটি তার কাঁধের কাছে ঝুলছে। মশার আওয়াজের মতো পিনপিন একটি শব্দ আসছে সেখান থেকে।

'এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারা যায় এবং সে ভাষায় কথা বলা যায়। প্রাণীদের মস্তিষ্কের নিওরোনে বিভিন্ন ধ্বনির যে লাইব্রেরি আছে এবং শব্দবিন্যাসের যে সমস্ত ধারা তা এই যন্ত্রটি ধরতে পারে।'

বাবলুর একটু ভয় ভয় লাগল। লোকটি বলল, 'এই যে চারদিকে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে এরা কী বলছে তা তুমি বুঝতে পারবে যদি যন্ত্রটা তোমার কাঁধে ঝুলিয়ে দেই, দেব ?'

বাবলু ভয়ে ভয়ে বলল, 'দিন, কিন্তু ব্যথা লাগবে না তো ?'

'উঁহু। মাথা খানিকটা ভোঁ-ভোঁ করবে হয়ত। দিয়েই দেখ।'

হইয়েৎসুঁন যন্ত্রটা বাবলুর কাঁধে বসিয়ে দিতেই বাবলু শুনল, ঝিঁঝি পোকাগুলো কথা বলছে।

'পোকা চাই। খাবারের জন্যে পোকা চাই।'

এ লোক দু'টি যাচ্ছে না কেন ? কী করছে, কী করছে ?'

'এরা দুজন কী করছে ?'

'পোকা চাই। পোকা চাই। পোকা চাই।'

বাবলু স্তম্ভিত হয়ে গেল। লোকটি বলল, 'মানুষ যেভাবে কথা বলে এরা কিন্তু সেভাবে কথা বলে না। ডানার সঙ্গে ডানা ঘসে শব্দ করে। ভাবের আদান-প্রদানের কত অদ্ভুত ব্যবস্থাই না প্রাণিজগতে আছে!

বাবলু তার কথায় কান দিচ্ছিল না। কারণ, সে পরিষ্কার শুনতে পেল জামগাছের একটি পাখির বাসা থেকে ফিসফিস করে কথাবার্তা হচ্ছে।

'আহা, এই লোক দু'টি কি বকবক শুরু করেছে? ঘুমুতে দেবে না নাকি?'

'ঠিক বলেছ। মানুষদের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। এগুলো মহাবোকা।'

বলতে বলতে পাখিগুলো খিকখিক করে হাসতে লাগল।

লোকটি বলল, 'বাবলু যন্ত্রটি এবার খুলে ফেলা যাক। তোমার অভ্যাস নেই তো, মাথা ধরে যাবে।'

বাবলু বলল, 'আমি যদি এখন ওদের সঙ্গে কথা বলি ওরা আমার কথা বুঝতে পারবে?'

'দু' একটা কথা বুঝতে পারে। তবে বেশির ভাগই বুঝবে না। ওদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নস্তরের। অবশ্যি সবার না। পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। যেমন ধরো তিমি মাছ।'

'তিমি মাছ বুদ্ধিমান?'

'অত্যন্ত বুদ্ধিমান। শুধু হাত নেই বলে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারে না। ডলফিনও খুব বুদ্ধিমান। ওদের যদি হাত থাকত তাহলে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যেত।'

'ওদের হাত নেই কেন?'

'প্রকৃতির খেয়াল। প্রকৃতির খেয়ালিপনার জন্যে তিমি এবং ডলফিনের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীদেরও পশুর মতো জীবনযাপন করতে হচ্ছে।'

হইয়েৎসুঁন একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে যন্ত্রটা বাবলুর কাঁধ থেকে নিয়ে নিল।

'এবার তোমার ব্যাপারটা চিন্তা করা যাক। কী ঠিক করলে? জাহাজের খালাসি হবে?'

'না।'

'তবে কি? অন্ধকারে জামগাছের নিচে বসে থাকবে?'

'উহু। আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বি।'

'কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমাদের চলাফেরার জন্যে রকেট বা স্পেসশিপ নেই। আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাই সরাসরি বস্তু স্থানান্তর প্রক্রিয়ায়। তোমাকে দিয়ে তা হবে না। তাছাড়া আমি এখন যাব তোমাদের বৃহস্পতি গ্রহের একটি চাঁদে। তার নাম হচ্ছে টিটান। সেখানে অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী আছে।'

'আমিও আপনার সঙ্গে টিটানে যাব।'

'একেবারেই অসম্ভব। সে জায়গাটা বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাসে ভরপুর। তার উপর আছে সালফার ডাই-অক্সাইড। আমার তাতে কিছু হবে না। কিন্তু তুমি মারা যাবে সঙ্গে সঙ্গে।'

বাবলু মুখ কালো করে চুপ করে রইল। লোকটি শান্তস্বরে বলল, 'তুমি বরং ভালমতো পড়াশোনা শুরু করো। কারণ, তোমাদের এখানে অনেক কিছুই শেখার আছে। অংকে সাড়ে আট পেলে হবে না।'

বাবলু কোন উত্তর দিল না। লোকটি বলল, 'মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর। ইচ্ছে করলেই এরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে।'

বাবলু মুখ কালো করে বলল, 'আমি অংক-টংক কিচ্ছু শিখতে চাই না।'

হুইয়েৎসুঁন হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, 'মানুষেরা প্রাণী হিসেবে কিন্তু খুব অদ্ভুত। এরা প্রায় সময়ই যা ভাবে তা বলে না। মুখে এক কথা বলে কিন্তু মনের কথা ভিন্ন। তুমি মনে মনে ভাবছ এখন থেকে খুব মন দিয়ে অংক শিখবে যাতে ও ধরনের যন্ত্র বানাতে পার কিন্তু মুখে বলছ অন্য কথা। ঠিক না?'

বাবলু থেমে থেমে বলল, 'আপনি কী করে বুঝলেন?'

'আমার কাছে ছোটখাটো একটা কমুনিকেটর যন্ত্র আছে। তা দিয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীরা কী ভাবছে তা অনেক দূর থেকে টের পাওয়া যায়। যেমন ধরো, যন্ত্রটা তোমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিলে তুমি বুঝতে পারবে তোমার বাবা এবং তোমার ধীরেন স্যার এই মুহূর্তে কী ভাবছেন। তাঁরা দু'জনেই হারিকেন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তোমাদের স্কুলের দপ্তরি আনিস মিয়া বাসায় গিয়ে খবর দেয়ার পর থেকেই তোমার বাবা খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। তোমার বাবার মনের অবস্থাটা বুঝতে চাও?'

বাবলু মাথা নাড়ল, সে বুঝতে চায়। লোকটি যন্ত্রটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিতেই বাবলু শুনল, বাবা মনে মনে বলছেন, আমার পাগলা ছেলেটা কোন্ অন্ধকারে একা একা বসে আছে কে জানে!

সাড়ে আট পেয়েছে তো কী হয়েছে? আহা বেচারা! আমার ভয়ে বাড়িও আসতে পারছে না। নাহ্ আর কোনদিন রাগারাগি করব না। ভাবতে ভাবতে বাবা চোখ মুছলেন।

==========

ধীরেন স্যারও ঠিক একই রকম কথা ভাবছে। আহারে বাচ্চা ছেলেটা কোথায় না কোথায় বসে আছে অন্ধকারে। খাতায় গরু লেখাটা খুবই অন্যায় হয়েছে। সেই লজ্জাতেই বাড়ি যাচ্ছে না। নাহ্, ছাত্রদের সঙ্গে আরেকটু ভদ্র ব্যবহার করা দরকার। আর এই রকম রাগারাগি করব না। বাবলুটাকে রোজ এক ঘন্টা করে অংক শেখাব।

হইয়েৎসুঁন হাসতে হাসতে বলল, 'কী, শুনলে তাদের মনের কথা ?'

'হুঁ।'

'জাহাজের খালাসি হবার পরিকল্পনা এখনো আছে ?'

'জ্বি না।'

'ভাল। খুব ভাল। তা বাবলু সাহেব, আমার তো এখন যেতে হয়।'

'আরেকটু বসুন।'

'না, আর বসা যাচ্ছে না। তোমার বাবা আর তোমার স্যার এদিকেই আসছেন। আমাকে দেখলে ব্যাপারটা ভাল হবে না। যাই তাহলে, কেমন ?'

তার কথা শেষ হবার আগেই বাবাকে এবং ধীরেন স্যারকে দেখা গেল। দপ্তরি আনিস মিয়া একটি হারিকেন হাতে আগে আগে আসছে। বাবলু ভিন গ্রহের লোকটিকে আর দেখতে পেল না।

বাবা এসেই প্রচণ্ড একটা চড় বসালেন। রাগী গলায় বললেন, 'এই বয়সে বাঁদরামি শিখেছিস। বাড়ি না গিয়ে গাছের নিচে বসে ধ্যান করা হচ্ছে। তোর পিঠের ছাল তুলব আজকে।'

ধীরেন স্যার থমথমে স্বরে বললেন, 'খারাপ পরীক্ষা হয়েছে—কোথায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বই নিয়ে বসবি তা না, সাপখোপের আড্ডার মধ্যে এসে বসা। আগামীকাল তুই সারা পিরিয়ড আমার ক্লাসে নিলডাউন হয়ে থাকবি। গরু কি আর সাধে লিখেছি ?'

বাবলু এঁদের কথায় একটুও রাগ করল না। কারণ, এখন সে নিশ্চিত জানে এসব তাদের মনের কথা নয়। তাছাড়া সে হারিকেনের আলোয় স্পষ্ট দেখল বাবার চোখ ভেজা। কাঁদতে কাঁদতেই তাকে খুঁজছিলেন।

কুদ্দুসের একদিন

==========

==========

পত্রিকা অফিসে কাজ করতে এসে তার গত তিন বছরে দশ হাজার পাঁচশ' টাকা জমে গেছে। অকল্পনীয় একটা ব্যাপার। টাকাটা পত্রিকার সম্পাদক মতিয়ুর রহমান সাহেবের কাছে জমা আছে। চাইলেই উনি দেন। কুদ্দুসের টাকার কোন দরকার নেই, তবু মাঝে মাঝে মতিয়ুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে টাকাগুলি চেয়ে আনে। সারাদিন হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থেকে সন্ধ্যাবেলা ফেরত দিয়ে আসে। টাকা হাতে নিরিবিলি বসে থাকতে তার ভাল লাগে। নিজেকে রাজা-বাদশার মতো মনে হয়।

আজ সকালে তেমন কোন কারণ ছাড়াই কুদ্দুসের নিজেকে রাজা-বাদশার মতো মনে হতে লাগল। সে চায়ের কাপ এবং পত্রিকা হাতে বসেছে। পা নাচাতে নাচাতে কাগজ পড়ছে। মজার মজার খবরে আজ কাগজ ভর্তি। খবরগুলি পড়ে ফেললেই তো মজা শেষ হয়ে গেল, কাজেই কুদ্দুস প্রথমে শুধু হেড লাইনে চোখ বুলাবে। ভেতরের ব্যাপারগুলি ধীরেসুস্থে পড়া যাবে। তাড়া কিছু নেই। সম্পাদক সাহেব চলে এসেছেন। তাঁকে প্রথম দফায় চা দেয়া হয়েছে, তিনি ঘণ্টাখানিকের ভেতর আর ডাকবেন না। কুদ্দুস শিস দিয়ে একটা গানের সুর তোলার চেষ্টা করতে লাগল—পাগল মন...। গানটা খুব হিট করেছে।

কুদ্দুস পত্রিকার তিন নাম্বার পাতাটা খুলল। "আজকের দিনটি কেমন যাবে" তিন নম্বর পাতায় ছাপা হয়। কুদ্দুস এই অংশটা প্রথম পড়ে। তার ধনু রাশি। তার ব্যাপারে 'আজকের দিনটি কেমন যাবে'তে যা লেখা হয় সব মিলে যায়। একবার লেখা হল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। সেদিন অকারণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বুড়ো আঙুলের নখের অর্ধেকটা ভেঙে গেল।

আজকের রাশিফলে লেখা—

ধনু রাশির জন্যে আজ যাত্রা শুভ। ভ্রমণের যোগ আছে।

কিঞ্চিত অর্থনাশের আশঙ্কা। শত্রুপক্ষের তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। শত্রুর কারণে সম্মানহানির আশঙ্কা।

সম্মানহানির আশংকায় কুদ্দুস খানিকটা চিন্তিত বোধ করছে। সম্মান বলতে গেলে কিছুই নেই। যা আছে তাও যদি চলে যায় তো মুশকিল। পত্রিকার সব হেড লাইন শেষ করবার আগেই কুদ্দুসের ডাক পড়ল। মতিয়ুর রহমান সাহেবের ইলেকট্রিক বেল ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল। কুদ্দুস এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যে তার কাপ থেকে চা পুরোটা ছলকে গায়ে পড়ে গেল। শার্টটা নতুন কেনা। আজ নিয়ে মাত্র তৃতীয়বার পরা হয়েছে। সাদা কাপড়ের চায়ের রঙ

সহজে ওঠে না। এক্ষুণি ধুয়ে ফেলতে পারলে হত। সেটা সম্ভব না। মতিয়ুর রহমান স্যার ডেকেছেন। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করা যাবে না। কুদ্দুস প্রায় ছুটে সম্পাদক সাহেবের ঘরে ঢুকল।

মতিয়ুর রহমান সাহেব বললেন, তোর খবর কী রে কুদ্দুস?

কুদ্দুস বিনয়ে মাথা নিচু করে বলল, খবর ভাল স্যার।

'একটা কাজ করে দে তো—এই চিঠিটা নিয়ে যা। নাম-ঠিকানা লেখা আছে। হাতে হাতে দিয়ে আসবি।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'জাভেদ সাহেব ইস্টার্ন প্লাজার নয় তলায় থাকেন। ইস্টার্ন প্লাজা চিনিস তো?'

'জ্বি স্যার, চিনি।'

'খুবই জরুরি চিঠি। হাতে হাতে দিবি। উনাকে বলবি আমাকে টেলিফোন করতে। আমি অফিসেই থাকব। নে টাকাটা নে, রিকশা করে চলে যা।'

মতিয়ুর রহমান সাহেব কুড়ি টাকার একটা নোট বের করে কুদ্দুসের হাতে দিলেন। কুদ্দুস টাকা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হল। রওনা হবার আগে শার্টটা পানি দিয়ে একবার ধুয়ে ফেলতে হবে। কতক্ষণের মামলা? কুদ্দুস বাথরুমের দিকে যাচ্ছে, আবার মতিয়ুর রহমান সাহেবের বেল বেজে উঠল। আবারও কুদ্দুস ছুটে গিয়ে ঢুকল। সম্পাদক সাহেবের ঘরে ঢুকলে কুদ্দুসের মাথা ঠিক থাকে না।

'কুদ্দুস!'

'জ্বি স্যার।'

'রিকশায় যাওয়ার দরকার নেই, দেরি হবে। তুই এক কাজ কর, আমার গাড়ি নিয়ে চলে যা। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

'রিকশা ভাড়ার টাকাটা ফেরত দেবার জন্যে কুদ্দুস কুড়ি টাকার নোটটা বের করল। মতিয়ুর রহমান সাহেব বললেন, টাকা ফেরত দিতে হবে না। তুই দেরি করিস না। চলে যা।

শার্ট না ধুয়েই কুদ্দুস গাড়িতে উঠল। তার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। শার্টের এই রঙ তো আর উঠবে না। নতুন শার্ট। মাত্র তিনবার পরা হয়েছে। গাড়িতে উঠে তার আরেকটু মন খারাপ হল—আবার একটা ভুল করা হয়েছে। পত্রিকাটা সাথে নিয়ে এলে হত। গাড়িতে যেতে যেতে কাগজ পড়ার আলাদা

==========

একটা মজা আছে। বসনিয়া-হার্জিগোভিনার গরম খবর আছে। আজকের দিনটা ভুল দিয়ে শুরু হয়েছে। আজকের তারিখটা কত যেন ? ১৪ এপ্রিল ১৯৯৬, তারিখটা তার জন্যে শুভ না।

লিফটে কুদ্দুস একা। লিফটম্যান তাকে ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দিয়ে বলেছে—আট তলায় গিয়ে থামবে। নেমে যাবেন। পারবেন না ? কুদ্দুস বলেছে, পারব। তার কথা শেষ হবার আগেই লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। লিফট চলছে না। স্থির হয়ে আছে। একটা লালবাতি জ্বলছে আর নিভছে। মাথার উপর শাঁশাঁ শব্দে ফ্যান ঘুরছে। অদ্ভুত ফ্যান। গায়ে কোন বাতাস লাগছে না। লিফটের ভেতর বিরাট একটা আয়না লাগানো। আয়নার দিকে তাকিয়ে কুদ্দুসের মন খারাপ হয়ে গেল। শার্টের দাগ বিশ্রীভাবে দেখা যাচ্ছে। এখন লন্ড্রিতে দিয়েও লাভ হবে না। টাকা খরচ হবে অথচ দাগ উঠবে না। আচ্ছা, লিফট্‌টা চলছে না, ব্যাপারটা কী ? লিফটম্যান মনে হয় শুধু দরজা বন্ধ করার বোতাম টিপেছে, ওপরে উঠার বোতাম টিপতে ভুলে গেছে। সে কি সাত লেখা বোতামটা টিপবে ? কুদ্দুস মনস্থির করতে পারছে না। এ কী বিপদে পড়া গেল ! আগে জানলে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে হেঁটে উপরে উঠে যেত। আট তলায় ওঠা এমন কোন ব্যাপার না।

পাগল মন গানটার প্রথম লাইনটা কুদ্দুস মনে মনে কয়েকবার গাইল। ইচ্ছে করলে শব্দ করেও গাইতে পারে। লিফটে সে একা। লিফটের ভেতরে গান গাইলে কি বাইরে থেকে শোনা যায় ?

হোঁস করে একটা শব্দ হয়ে লিফটের ভেতরটা পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। ইলেকট্রিসিটি কি চলে গেল ? কুদ্দুসের বুকে ধক্ করে একটা ধাক্কা লাগল। ঢাকা শহরে কারেন্টের কোন ঠিকঠিকানা নেই। একবার চলে গেলে কখন আসবে কে জানে। লিফটের ভেতর কতক্ষণ থাকতে হবে ? লিফটম্যান যে গেছে তারও ফেরার নাম নেই। কী হচ্ছে না হচ্ছে সে খোঁজ-খবর করবে না ? এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাল না। মতিয়ুর রহমান স্যারের হাতে পড়ত—এক প্যাঁচে ঠিক করে দিত।

কুদ্দুস খুব সাবধানে লিফটের দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দিল। জোরে ধাক্কা দিতে সাহসে কুলুচ্ছে না। কল-কবজার কারবার—কী থেকে কী হয় কে জানে ? গরম লাগছে। আবার দমবন্ধও লাগছে। কুদ্দুস বেশ উঁচু গলায় ডাকল, লিফটম্যান ব্রাদার, হ্যালো ! হ্যালো !

কতক্ষণ পার হয়েছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। কুদ্দুসের মনে হল ঘণ্টাখানেকের কম না। বেশিও হতে পারে। সারাদিনে যদি কারেন্ট না আসে

==========

তাহলে কী হবে ? লিফটের ভেতর থাকতে হবে ? কুদ্দুস লিফটের দরজায় আরেকবার ধাক্কা দিল আর তাতেই লিফট চলতে শুরু করল। কারেন্ট ছাড়াই কি চলছে ? লিফটের ভেতরটা ঘোর অন্ধকার। কারেন্ট এলে তো বাতি-ফাতি জ্বলত। কিছুই জ্বলেনি। কুদ্দুস মনে মনে বলল, চলুক, কারেন্ট ছাড়াই চলুক। চলা দিয়ে হচ্ছে কথা।

শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। কুদ্দুসের শরীর কাঁপছে। লিফট কি এত দ্রুত ওঠে ? এ তো মনে হচ্ছে বাড়িঘর ফুঁড়ে আসমানে উঠে যাবে। এত দ্রুত লিফট উঠছে যে কুদ্দুসের পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। যে ভাবে উঠছে তাতে ১০০ তলা ছাড়িয়ে যাবার কথা। এটা মাত্র বার তলা বিল্ডিং। কুদ্দুস আসহাবে কাহাফের আটটা নাম মনে করার চেষ্টা করছে। এদের নাম পড়ে বুকে ফুঁ দিলে মহা বিপদ দূর হয়। বহু পরীক্ষিত। এরা আটজন দাকিয়ানুস বাদশাহর সময়ে পর্বতের গুহায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রোজ কেয়ামত পর্যন্ত এরা ঘুমন্ত থাকবে। এদের সাতজন মানুষ, একটা কুকুর। সাতজন মানুষের নাম মনে পড়ছে, কুকুরটার নাম মনে পড়ছে না।

মাকসেলাইনিয়া
মাসলিনিয়া
ইয়ামলিখা
মারনুশ
দাবারনুশ
শযনুষ
কাফশাততাইউশ

কুকুরটার নাম কী ?

কুকুরের নাম মনে করতে না পারলে কোন লাভ হবে না। কুকুরের নামশুদ্ধ পড়ে বুকে ফুঁ দিতে হয়। কুদ্দুস প্রাণপণে কুকুরটার নাম মনে করার চেষ্টা করছে। চরম বিপদে কিছুই মনে পড়ে না।

শোঁ শোঁ শব্দ বাড়ছেই। শব্দটা এখন কানের পর্দার ভেতরে হচ্ছে। কুদ্দুসের মুখ শুকিয়ে গেছে। সে লিফটের মেঝেতে বসে পড়ল। আর তখনই কুকুরটার নাম মনে পড়ল—কিতমীর !

কিতমীর নাম পড়ার পরপরই হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে লিফট থেমে গেল। লিফটের দরজা খুলতে শুরু করল। দরজা পুরোপুরি খোলার জন্যে কুদ্দুস

অপেক্ষা করল না। সে বসা অবস্থা থেকেই ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে বের হয়ে পড়ল। বের হয়েই হতভম্ব হয়ে গেল। সে কোথায় এসেছে ? ব্যাপারটা কী ? লিফট থেকে বের হওয়াটা বিরাট বোকামি হয়েছে। যে ভাবে লাফ দিয়ে সে লিফট থেকে বের হয়েছে তার উচিত ঠিক একইভাবে লাফ দিয়ে আবার লিফটে ঢুকে যাওয়া। সে পেছনে তাকালো। পেছনে লিফট নেই। লিফট কেন কোন কিছুই নেই, চারদিকে ভয়াবহ শূন্যতা। সে নিজেও বসে আছে শূন্যের উপর। মাথার উপর আকাশ থাকার কথা। আকাশ-ফাকাশ কিচ্ছু নেই। তার চারপাশে কুয়াশার মতো হালকা ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার রঙ ঈষৎ গোলাপি। কুদ্দুস মনে মনে বলল, ইয়া গাফুরুর রাহিম। এ কী বিপদে পড়লাম ! ও আল্লাহপাক, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো। হে গাফুরুর রাহিম ! একবার যদি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাই তাহলে শুক্রবারে তারা মসজিদে সিন্নি দেব। এবং বাকি জীবনে আর লিফটে চড়ব না। দরকার হলে ৫০০ তলা পর্যন্ত হেঁটে উঠব। আমার উপর দয়া করো আল্লাহপাক।

কুদ্দুস চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই সে তিনবার কুলহুআল্লাহ পড়ে বুকে ফুঁ দেবে। তারপর চোখ খুলবে। তাতে যদি কিছু হয়। কোন দোয়াই প্রথম চোটে মনে পড়ছে না। হায়, এ কেমন বিপদ !

==========

২

কুদ্দুস চোখ খুলল। অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আগে চারপাশে ছিল গোলাপি রঙের ধোঁয়া, এখন বেগুনি ধোঁয়া। আগে কোন শব্দ ছিল না। এখন একটু পর পর সাপের শিসের মতো তীব্র শব্দ হচ্ছে। শব্দটা শরীরের ভেতরে ঢুকে কলজে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এরচে' তো আগেই ভাল ছিল। কুদ্দুস ভেবে পাচ্ছে না সে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলবে কি না। চোখ বন্ধ রাখা আর খোলা তো একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে সে মারা গেছে? হার্টফেল করে লিফটের ভেতরই তার মৃত্যু হয়েছে? সে যে জগতে আছে সেটা আর কিছুই না, মৃত্যুর পরের জগৎ। এ রকম তো হয়। কিছু বোঝার আগেই কত মানুষ মারা যায়। সেও মারা গেছে, মৃত্যুর পর তাকে আবার জিন্দা করা হয়েছে। কিছুক্ষণের ভিতর মানকের-নেকের আসবে, তাকে সোয়াল-জোয়াব শুরু করবে—"তোমার ধর্ম কী?" "তোমার নবী কে?" এইসব জিজ্ঞেস করবে। এ কী বিপদ!

'তুমি কে?'

কুদ্দুস চমকে চারদিকে তাকালো, কাউকে সে দেখতে পেল না। প্রশ্নটা সে পরিষ্কার শুনলো। তাকেই যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে। কেমন গম্ভীর ভারি গলা। শুনলেই ভয় লাগে।

'এই, তুমি কে?'

কুদ্দুস কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, স্যার, আমার নাম কুদ্দুস।

'তুমি এখানে কীভাবে এসেছ?'

'স্যার, আমি কিছুই জানি না। লিফটের ভিতরে ছিলাম। লাফ দিয়ে বের হয়েছি। বাইর হওয়া উচিত হয় নাই। আপনে স্যার এখন একটা ব্যবস্থা করেন। গরিবের একটা রিকোয়েস্ট।'

'আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি এখানে এলে কী করে?'

'স্যার আমার ভুল হয়েছে। ক্ষমা করে দেন। কোথায় আসছি নিজেও জানি না। কীভাবে আসছি তাও জানি না। লিফটের দরজা ভালমত খোলার আগেই

লাফ দিয়েছিলাম। এটা স্যার অন্যায় হয়েছে। আর কোনদিন করব না। সত্যি কথা বলতে কী—আর কোনদিন লিফটেও চড়ব না। এখন স্যার ফেরত পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করেন। আমি খাস দিলে আল্লাহ্‌পাকের কাছে আপনার জন্যে দোয়া করব।'

'তোমার কোন কিছুই তো আমরা বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা হল—মাত্রা কী করে ভাঙলে ? মাত্রা ভেঙে এখানে এলে কীভাবে ?'

'স্যার বিশ্বাস করেন, আমি কোন কিছুই ভাঙি নাই। যদি কিছু ভেঙে থাকে আপনা আপনি ভাঙছে। তার জন্যে স্যার আমি ক্ষমা চাই। যদি বলেন, পায়ে ধরব। কোন অসুবিধা নাই।'

'তুমি তো বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছ। তুমি কি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কী ঘটেছে ?'

'জ্বি না।'

'তুমি ত্রি-মাত্রিক জগৎ থেকে চতুর্মাত্রিক জগতে প্রবেশ করেছ। এই কাণ্ডটা কীভাবে করেছ আমরা জানি না। আমরা জানার চেষ্টা করছি।'

'স্যার, ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। সারাজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।'

'তোমার কথাবার্তাও তো আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। গোলাম হয়ে থাকব মানে কী ?'

কুদ্দুস ব্যাকুল গলায় বলল, স্যার, গোলাম হয়ে থাকব মানে হল স্যার আপনার সার্ভেন্ট হয়ে থাকব। আমি মুখ দেখতে পারছি না। মুখ দেখতে পারলে ভয়টা একটু কমতো।'

'আমরা ইচ্ছা করেই তোমাকে মুখ দেখাচ্ছি না। মুখ দেখালে ভয় আরো বেড়ে যেতে পারে।'

'স্যার, যে ভয় লিফটের ভিতর পেয়েছি, এরপর আর কোন কিছুতেই কোন ভয় পাব না। রয়েল বেঙ্গলের খাঁচার ভেতর ঢুকে রয়েল বেঙ্গলকে চুমু খেয়ে আসব। তার লেজ দিয়ে কান চুলকাব, তাতেও স্যার ভয় লাগবে না।'

'তোমার নাম যেন কী বললে—কুদ্দুস ?'

'জ্বি স্যার, কুদ্দুস।'

'একটা জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা করো—তুমি হচ্ছ ত্রি-মাত্রিক জগতের মানুষ। তোমাদের জগতের প্রাণীদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এই তিনটি মাত্রা আছে। এই দেখে তোমরা অভ্যস্ত। আমরা চার মাত্রার প্রাণী। চার মাত্রার প্রাণী সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই।'

'স্যার, আপনি আমার মতো বাংলা ভাষায় কথা বলতেছেন, এইটা শুনেই মনে আনন্দ পাচ্ছি। আপনার চেহারা যদি খারাপও হয়, কোন অসুবিধা নাই, চেহারার উপর তো স্যার আমাদের হাত নাই। এটা হল বিধির বিধান।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমাকে দেখ।'

কুদ্দুসের শরীরে হালকা একটা কাঁপুনি লাগল। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে যে রকম লাগে, সে রকম। তারপরই মনে হতে লাগলো তার চারপাশে যত বেগুনি রঙ আছে সব তার চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। আবার চোখের ভেতর থেকে কিছু কিছু রঙ বের হয়ে আসছে। এ কী নতুন মুসিবত হল।

আচমকা রঙের আসা-যাওয়া বন্ধ হল। কুদ্দুস তার চোখের সামনে কী একটা যেন দেখল। মানুষের মতোই মুখ তবে স্বচ্ছ কাচের তৈরি। একটা মুখের ভেতর আরেকটা, সেই মুখের ভেতর আরেকটা—এই রকম চলেই গিয়েছে। মুখটার চোখ দু'টাও কাচের। সেই চোখের যে কোন একটার দিকে তাকালে তার ভেতরে আর একটা চোখ দেখা যায়, সেই চোখের ভেতর আবার আরেকটা...ঘটনা এই শেষ হলে হত, ঘটনা এইখানে শেষ না। কুদ্দুসের কখনো মনে হচ্ছে ভয়ংকর সে এই মানুষটার ভিতরে আছে, আবার পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে ভয়ংকর এই মানুষটা তার ভেতরে বসে আছে। এই কুৎসিত জিনিসটাকে মানুষ বলার কোন কারণ নেই, মানুষ ছাড়া কুদ্দুস তাকে আর কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'জ্বি না, স্যার। যদি কিছু মনে না করেন—একটু পেসাব করব, পেসাবের বেগ হয়েছে।'

'কী করবে?'

'প্রস্রাব করব। আপনাদের বাথরুমটা কোন্ দিকে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না—কী করতে চাও?'

'স্যার, একটু টয়লেটে যাওয়া দরকার।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন। তুমি তো আমাদের মহা সমস্যায় ফেললে। আমাদের এখানে এরকম কোন ব্যবস্থা নেই।'

'বলেন কী স্যার!'

'আমরা দেহধারী প্রাণী নই। দেহধারী প্রাণীদের মতো আমাদের খাদ্যের যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি টয়লেটেরও প্রয়োজন নেই। এখন তুমি টয়লেটে যেতে চাচ্ছ, আমাদের ধারণা কিছুক্ষণ পর তুমি বলবে খিদে পেয়েছে।'

'সত্যি কথা বলতে কী স্যার, খিদে পেয়েছে। সকাল বেলা নাশতা করি নাই। মারাত্মক খিদে লেগেছে। চক্ষুলজ্জার জন্যে বলতে পারি নাই। সকাল থেকে এই পর্যন্ত কয়েক চুমুক চা শুধু খেয়েছি, পত্রিকাও পড়া হয় নাই—আপনাদের এখানে পত্রিকা আছে স্যার ?'

'না, পত্রিকা নেই।'

'জায়গা তো তাহলে খুব সুবিধার না।'

'আমাদের জায়গা আমাদের মতো, তোমাদের জায়গা তোমাদের মতো।'

'আপনাদের তাহলে 'ইয়ে' হয় না ?'

'ইয়ে মানে কী ?'

'পেসাব-পায়খানার কথা বলতেছি—বর্জ্য পদার্থ।'

'না, আমাদের এই সমস্যা নেই। তোমাকে তো একবার বলা হয়েছে আমরা তোমাদের মতো দেহধারী না। শুধু দেহধারীদেরই খাদ্য লাগে। খাদ্যের প্রশ্ন যখন আসে তখনই চলে আসে বর্জ্য পদার্থের ব্যাপার।'

'তবু স্যার, আমার মনে হয় বাইরের গেস্টদের জন্য দুই-তিনটা টয়লেট বানিয়ে রাখা ভাল।'

'দেহধারী কোন অতিথির আমাদের এখানে আসার উপায় নেই।'

'আপনি তো স্যার একটা মিসটেক কথা বললেন। আমি চলে এসেছি না ?'

'হ্যাঁ, তুমি চলে এসেছ। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কীভাবে এসেছ সেই রহস্য এখনো ভেদ করা সম্ভব হয় নি।'

'স্যার বিশ্বাস করেন, নিজের ইচ্ছায় আসি নাই। যে দেশে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই, পেসাব-পায়খানার উপায় নাই, সেই দেশে খামাখা কি জন্যে আসব বলেন ? তাও যদি দেখার কিছু থাকত, একটা কথা ছিল। দেখারও কিছু নাই। স্যার, আপনাদের সমুদ্র আছে ?'

'হ্যাঁ আছে। তবে সে সমুদ্র তোমাদের সমুদ্রের মতো না। আমরা সময়ের সমুদ্রে বাস করি। তোমাদের কাছে সময় হচ্ছে নদীর মতো বয়ে যাওয়া। আমাদের সময় নদীর মতো প্রবহমান নয়, সমুদ্রের মতো স্থির।'

'মনে কিছু নেবেন না স্যার, আপনার কথা বুঝতে পারি নাই।'

'সময় সম্পর্কিত এই ধারণা ত্রি-মাত্রিক জগতের প্রাণীদের পক্ষে অনুধাবন করা খুবই কঠিন। অংক এবং পদার্থবিদ্যায় তোমার ভাল জ্ঞান থাকলে চেষ্টা করে দেখতাম।'

'এটা বলে স্যার আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমি খুবই মূর্খ। অবশ্য স্যার মূর্খ হবার সুবিধাও আছে। মূর্খদের সবাই স্নেহ করে। বুদ্ধিমানদের কেউ স্নেহ

করে না। ভয় পায়। মতিয়ুর রহমান স্যার যে আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে তার কারণ একটাই—আমি মূর্খ। বিরাট মূর্খ।'

'ও আচ্ছা।'

'উনার স্ত্রীও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। গত ঈদে আমাকে পায়জামা আর পাঞ্জাবি দিলেন। পাঞ্জাবি সিল্কের। এই রকম সিল্ক সচরাচর পাওয়া যায় না, অতি মিহি—এক্সপোর্ট কোয়ালিটি সিল্ক। যা তৈরি হয় সবই বিদেশে চলে যায়। উনাদের কানেকশন ভাল বলে এইসব জিনিস যোগাড় করতে পারে। যাই হোক, পাঞ্জাবি সাইজে ছোট হয়ে গিয়েছিল, সেটা আর উনাকে বলি নাই, মনে কষ্ট পাবেন। শখ করে একটা জিনিস কিনেছেন।'

'কুদ্দুস।'

'জ্বি স্যার।'

'তোমাকে আমাদের পছন্দ হয়েছে।'

'এই যে স্যার বললাম—মূর্খদের সবাই পছন্দ করে। আপনারা বেশি জ্ঞানী, কেউ আপনাদের পছন্দ করবে না। সত্যি কথা বলতে কী স্যার, আপনাদের ভয়ে আমি অস্থির। আপনাদের দিকে তাকাতেও ভয় লাগতেছে।'

'ভয়ের কিছু নেই আমরা তোমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।'

'আপনাদের পা থাকলে স্যার ভাল হত। আপনাদের পা ছুঁয়ে সালাম করতাম।'

'তোমার প্রতি আমাদের মমতা হয়েছে যে কারণে আমরা এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাতে তোমার নিজের জায়গায় যখন ফিরবে তখন তোমার জীবন আনন্দময় হবে।'

'বললে হয়তো স্যার আপনারা বিশ্বাস করবেন না, আমি খুব আনন্দে আছি।'

'আনন্দে থাকলেও তোমার জীবন মোটামুটিভাবে অর্থহীন এটা বলা যায়। জীবন কাটাচ্ছ অন্যের জন্যে চা বানিয়ে।'

'কী করব স্যার বলেন, পড়াশোনা হয় নাই, ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিতে পারলাম না। ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষার আগের দিন রাতে বাবাকে সাপে কাটল। চোখের সামনে ধড়ফড় করতে করতে মৃত্যু।'

'আমরা কী করছি মন দিয়ে শোনো, তোমাকে ফেরত পাঠাচ্ছি ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষার আগের দিন রাতে। তুমি সেখান থেকে জীবন শুরু করবে। বাবাকে যাতে সাপে না কাটে সেই ব্যবস্থা করবে।'

'সেটা স্যার কী করে সম্ভব?'

'সময় আমাদের কাছে স্থির। আমরা তা পারি। তুমি যখন ফিরে যাবে তখন এখানকার স্মৃতি তোমার থাকবে না। তবে তোমার বাবাকে সাপে কাটবে এই ব্যাপারটা তোমার মনে থাকবে। এটা যাতে মনে থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। নতুন জীবন তোমার শুরু হচ্ছে। সেখানে তোমার বাবাকে সাপে কাটবে না। তোমার বুদ্ধিবৃত্তিও কিছু উন্নত করে দিচ্ছি। পড়াশোনায় তুমি অত্যন্ত মেধার পরিচয় দেবে!'

'অংকটা নিয়ে স্যার সমস্যা। অংকটা পারি না। খুব বেড়াছেড়া লাগে।'

'আর বেড়াছেড়া লাগবে না।'

'এখন কি স্যার আমি চলে যাচ্ছি?'

'কিছুক্ষণের মধ্যে যাচ্ছ।'

'ম্যাডামকে আমার সালাম দিয়ে দেবেন। উনার সঙ্গে দেখা হয় নাই।'

'ম্যাডামকে তোমার সালাম পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তোমাকে আগে একবার বলেছি আমরা দেহধারী নই। আমাদের মধ্যে নারী-পুরুষের কোন ব্যাপার নেই।'

'জ্বি আচ্ছা। না থাকলে কী আর করা! সবই আল্লাহ্‌র হুকুম। একটু দোয়া রাখবেন স্যার। এই বিপদ থেকে কোনদিন উদ্ধার পাব চিন্তা করি নাই।'

কুদ্দুস হঠাৎ তার বুকে একটা ধাক্কার মতো অনুভব করল। গভীর ঘুমে সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেই তার মনে হচ্ছে সে যেন অতল কোন সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। সেই সমুদ্রের পানি সিসার মতো ভারি, বরফের মতো ঠাণ্ডা। পানির রঙ গাঢ় গালাপি। সে তলিয়েই যাচ্ছে। তলিয়েই যাচ্ছে। এই সমুদ্রের কি কোন তলা নেই? না-কি এখন সে মারা যাচ্ছে?

কুদ্দুসের ঘুম পাচ্ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। সে চোখ মেলে রাখতে পারছে না। অথচ তার ইচ্ছা জেগে থাকে। অদ্ভুত ব্যাপার কী হচ্ছে দেখে।

==========

৩

কুদ্দুসের ঘুম ভেঙেছে।

সে তার গ্রামের বাড়িতে চৌকির উপর বই-খাতা মেলে পড়তে বসেছিল। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কী সর্বনাশের কথা। কাল ইংরেজি সেকেন্ড পেপার পরীক্ষা। রচনা এখনো দেখা হয় নি। অ্যা জার্নি বাই বোট এই বছর আসার কথা। গত বছর আসে নি। কুদ্দুস রচনা বই নিল। আর তখন মনে হল তাকে একটা সাপ মারতে হবে। সাপটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হবে। ভয়ংকর বিষধর একটা সাপ। এ রকম মনে হবার কী কারণ কুদ্দুস বুঝতে পারল না। তারপরও সে হ্যারিকেন হাতে নেমে এল। একটা মোটা লাঠি দরকার। লাঠি হাতে এক্ষুণি তাকে তার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। হাতে একটুও সময় নেই।

কেউ একজন তাকে বলছে—তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো। সেই কেউ একজনটা কে ? কুদ্দুস জানে না। শুধু জানে এক্ষুণি একটা সাপ তার বাবাকে ছোবল দিতে আসবে। তার দায়িত্ব সাপটাকে মারা। যদি মারতে পারে তবেই তার জীবন হবে অন্য রকম।

কুদ্দুস তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। ঐ তো সাপটা। শঙ্খচূড় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। হ্যারিকেনের আলোয় চোখ জ্বলজ্বল করছে।

সম্পর্ক

মোবারক হোসেন ভাত খেতে বসে তরকারির বাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কী ? তাঁর গলার স্বরে অদূরবর্তী ঝড়ের আভাস। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যাবে।

মনোয়ারা অদূরবর্তী ঝড়ের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্বাভাবিক গলায় বললেন, কী হয়েছে ?

'এটা কিসের তরকারি ?'

'কৈ মাছের ঝোল।'

'কৈ মাছের ঝোলে তরকারি কী ?'

'চোখে দেখতে পাচ্ছ না কী দিয়েছি ! ফুলকপি, সিম।'

'তোমাকে কতবার বলেছি—ফুলকপির সঙ্গে সিম দেবে না। ফুলকপির এক স্বাদ, সিমের আলাদা স্বাদ। আমার তো দু'টা জিভ না যে একটায় সিম খাব আর অন্যটায় ফুলকপি ?'

মনোয়ারা হাই তুলতে তুলতে বললেন, যে তরকারি খেতে ইচ্ছা করে সেটা নিয়ে খেলেই হয়। খেতে বসে খামাখা চিৎকার করছ কেন ?'

'এই তরকারি তো আমি মরে গেলেও খাব না।'

'না খেলে না খেয়ো। ডাল আছে ডাল খাও।'

'শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাব ?'

মনোয়ারা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এটা তো হোটেল না যে চৌদ্দ পদের রান্না আছে।

মোবারক হোসেনের প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছে তরকারির বাটি ছুড়ে মেঝেয় ফেলে দিতে। এই কাজটা করতে পারলে রাগটা ভালো দেখানো হয়। এতটা বাড়াবাড়ি করতে সাহসে কুলাচ্ছে না। মনোয়ারা সহজ পাত্রী না। তার চীনামাটির বাটি ভাঙবে আর সে চুপ করে থাকবে এটা হবার না। মোবারক হোসেন কৈ মাছের ঝোলের বাটি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধাক্কাটা হিসাব করে দিলেন, যেন তরকারি পড়ে যায় আবার বাটিটাও না ভাঙে।

মনোয়ারা বললেন, কী হল ? খাবে না ?

মোবারক হোসেন কিছু না বলে ভাতের থালায় হাত ধুয়ে ফেললেন। থালায় ভাত বাড়া ছিল। কিছু ভাত নষ্ট হল। হাত ধোয়ার দরকার ছিল না। তার হাত পরিষ্কার—খাওয়া শুরুর আগেই গণ্ডগোল বেধে গেল।

মনোয়ারা বললেন, ভাত খাবে না ?

মোবারক হোসেন বললেন, না। তোমার ভাতে আমি 'ইয়ে' করে দেই।

বাক্যটা খুব কঠিন হয়ে গেল। রাগের সময় হিসাব করে কথা বলা যায় না। তবে কঠিন বাক্যেও কিছু হল না। মনোয়ারা খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তরকারির বাটি, ডালের বাটি তুলে ফেলতে শুরু করলেন। যেন কিছুই হয় নি। মোবারক হোসেন স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। পরিবারের প্রধান মানুষটা রাগ করে বলছে—ভাত খাবে না, তাকে সাধাসাধি করার একটা ব্যাপার আছে না? মনোয়ারা কি বলতে পারত না—ভুল হয়েছে, ভবিষ্যতে আর কখনো সিম আর ফুলকপি একসঙ্গে রাঁধা হবে না। কিংবা বলতে পারত—দু'মিনিট বোসো চট করে একটা ডিম ভেজে দেই। শুকনা মরিচ আর পেঁয়াজ কচলে মরিচের ভর্তা বানিয়ে দেই। মরিচের ভর্তা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এই জিনিসটা বানাতে কতক্ষণ লাগে? তা-না, ভাত তরকারি তুলে ফেলছে! ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের এই হল ফসল।

মোবারক হোসেনের তীব্র ইচ্ছা হল বাড়িঘর ছেড়ে গৌতম বুদ্ধের মতো বের হয়ে পড়েন। এ রকম ইচ্ছা তাঁর প্রায়ই হয়। বাড়ি থেকে বেরও হন। রেলস্টেশনে গিয়ে ঘণ্টখানেক বসে থাকেন। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তাঁর রেলস্টেশন পর্যন্ত। মোবারক হোসেন নান্দাইল রোড রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার। রাত ন'টায় একটা আপ ট্রেন ছেড়ে দিয়ে খেতে এসেছিলেন। খেতে এসে এই বিপত্তি—সিম আর ফুলকপির ঘোঁট বানিয়ে বসে আছে।

মোবারক হোসেন মাফলার দিয়ে কান ঢাকতে শুরু করলেন। এটা হল তাঁর ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার সংকেত। অতি সহজে তাঁর কানে ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে সব সময় মাফলার দিয়ে কান ঢাকতে হয়। আর এ বছর তুন্দ্রা অঞ্চলের শীত পড়ছে। আগুনের উপর বসে থাকলেও শীত মানে না।

মনোয়ারা বললেন, যাচ্ছ কোথায়?

তিনি জবাব না দিয়ে গায়ে চাদর জড়ালেন।

'স্টেশনে যাচ্ছ?'

তিনি এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। হাতমোজা পরতে লাগলেন। হাতমোজা পরা ঠিক হচ্ছে না। মনোয়ারা মাত্র কিছুদিন আগে হাতমোজা বুনে দিয়েছেন। তার উচিত হাতমোজা জোড়া নর্দমায় ফেলে দেয়া—কিন্তু বাইরে মাঘ মাসের দুর্দান্ত শীত। খোলা মাঠের উপর রেলস্টেশন। শীত সহ্য হবে না। গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে না থেকে যদি নান্দাইল রোডে থাকতেন এবং মাঘ মাসে গৃহত্যাগ করতেন তা হলে তিনিও হাতমোজা পরতেন। গলায় মাফলার বাঁধতেন।

'রাতে ফিরবে ? না ফিরলে বলে যাও। দরজা লাগিয়ে দেব।'

'যা ইচ্ছা করো।'

'আমি কিন্তু শুয়ে পড়লাম। রাতদুপুরে ফিরে এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি করবে না।'

'তোর বাপের দরজা ? সরকারি বাড়ির সরকারি দরজা। আমার যখন ইচ্ছা ধাক্কাধাক্কি করব।'

'তুই তোকারি করবে না। আমি তোমার ইয়ার বন্ধু না।'

'চুপ। একদম চুপ। No talk.'

মোবারক হোসেন অগ্নিদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টির অর্থ— তুমি জাহান্নামে যাও। তিনি ঘরের কোনায় রাখা ছাতা হাতে বের হয়ে গেলেন। তিনি বের হওয়ামাত্র দরজা বন্ধ করার ঝপাং শব্দ হল। মোবারক হোসেন ফিরে এসে বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড লাথি বসালেন। এতে তাঁর রাগ সামান্য কমল। তিনি রেলস্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

রাত নিশুতি। ভয়াবহ ঠাণ্ডা পড়েছে। রক্ত-মাংস ভেদ করে শীত হাড়ের মজ্জায় চলে যাচ্ছে। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেছে। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। অথচ শুক্লপক্ষ, আকাশে চাঁদ আছে। মোবারক হোসেনের পকেটে দুই ব্যাটারির টর্চও আছে। টর্চ জ্বালাতে হলে চাদরের ভেতর থেকে হাত বের করতে হয়। তিনি তাঁর প্রয়োজন বোধ করছেন না। গত দশ বছর তিনি এই রাস্তায় যাতায়াত করছেন। চোখ বেঁধে দিলেও চলে আসতে পারবেন।

রেলস্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। পয়েন্টসম্যান হেদায়েত স্টেশনেই ঘুমায়। সে মনে হয় আছে। আজ তার বোনের বাড়িতে যাবার কথা। মনে হয় যায় নি। যে শীত নেমেছে যাবে কোথায় ? মোবারক হোসেন স্টেশনের বাতি দেখে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলেন। হেদায়েত থাকলে তাকে দিয়ে চিড়া-মুড়ি কিছু আনানো যাবে। খিদেয় তিনি অস্থির হয়েছেন। উপোস অবস্থায় রাত পার করা যাবে না। বিকেলেও কিছু খান নি। বিকেলে নাশতা হিসেবে মুড়ি এবং নারিকেলকোরা দিয়েছিল। এমন গাধা মেয়েছেলে ! নারিকেলকোরা হল ভেজা ন্যাতন্যাতা একটা জিনিস। মুড়িকে সেই জিনিস মিইয়ে দেবে এটা তো দুধের শিশুও জানে। দুই মুঠ মুখে দিয়ে তিনি আর খান নি। এখন অবিশ্যি মনে হচ্ছে ন্যাতন্যাতা মুড়িই তিনি এক গামলা খেয়ে ফেলতে পারবেন। তবে শীতের রাতের আসল খাওয়া হল আগুন গরম গরুর গোশত তার সঙ্গে চালের আটার রুটি। এই গরুর গোশত ভুনা হলে চলবে না। প্রচুর ঝোল থাকতে হবে।

==========

মনোয়ারাকে বললে সে ইচ্ছা করে করে ঝোল শুকিয়ে ভুনা করে ফেলবে। চালের আটার রুটি না করে আটার রুটি করবে এবং পরে বলবে...

মোবারক হোসেনের চিন্তার সূত্র হঠাৎ জট পাকিয়ে গেল। কারণ তার চোখে ধক করে সবুজ আলো এসে পড়ল। তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলালেন। আলোটা এসেছে স্টেশনঘর থেকে। কেউ মনে হয় টর্চ ফেলেছে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ বা এ রকম কিছু। হঠাৎ চোখে পড়েছে বলে সবুজ রং মনে হয়েছে। টর্চের আলো সবুজ হবার কোনো কারণ নেই।

নান্দাইল রোড রেলস্টেশনটা এই অঞ্চলের মতোই দরিদ্র। একটি ঘর। সেই ঘরে জানালা নেই। টিকিট দেয়ার জন্যে যে ফাঁকটা আছে তাকে জানালা বলার কোনো কারণ নেই। মোবারক হোসেন যখন এই ঘরে বসে টিকিট দেন তখন তাঁর মনে হয় তিনি কবরের ভেতর বসে আছেন। মানকের নেকের তাঁর সওয়াল জওয়াব করবে। সওয়াল জবাবের ফাঁকে ফাঁকে তিনি টিকিট দিচ্ছেন। সব স্টেশনে একটা টিউবওয়েল থাকে। যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে পানি খায়। ফ্লাস্ক ভরতি করে পানি নিয়ে ট্রেনে ওঠে। এই স্টেশনে কোনো টিউবওয়েল নেই। যাত্রীদের বসার জায়গা নেই। বছর তিনেক আগে দুটা প্রকাণ্ড রেইনট্রি গাছ ছিল। গাছ দুটার জন্য স্টেশনটা সুন্দর লাগত। আগের স্টেশনমাস্টার গাছ কাটিয়ে এগার হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। এতে পরে তার সমস্যা হয়েছিল—তাকে বদলি করে দেয়া হয়, তার জায়গায় আসেন মোবারক হোসেন। তাঁর চাকরি এখন শেষের দিকে। এই সময় কপালে কোনো ভালো স্টেশন জুটল না। জুটল ধ্যাদ্দাড়া নান্দাইল রোড। স্টেশনের লাগোয়া কোনো চায়ের স্টল পর্যন্ত নেই। হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছা হলে কেরামতকে পাঠাতে হয় ধোয়াইল বাজার। চা আনতে আনতে ঠাণ্ডা পানি। মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দিতে হয়। রেলস্টেশনের সঙ্গে চায়ের দোকান থাকবে না এটা ভাবাই যায় না। এর আগে তিনি যে স্টেশনে ছিলেন সেখানে দু'টা চায়ের দোকান ছিল। হিন্দু টি স্টল, মুসলিম টি স্টল। দু'টা চায়ের দোকানের মালিকই অবিশ্যি মুসলমান।

মোবারক হোসেন স্টেশনঘরের মাথায় এসে দাঁড়ালেন। চারদিক ধু-ধু করছে। জনমানব নেই। স্টেশনঘরের সামনে থেকে তাঁর চোখে যে আলো ফেলেছিল তাকেও দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না। মোবারক হোসেন ঠিক করলেন লোকটাকে দু-একটা কঠিন কথা বলবেন—'মানুষের চোখে টর্চ ফেলা অসম্ভব বেয়াদবি। মহারানী ভিক্টোরিয়াও যদি কারো চোখে টর্চ ফেলেন সেটাও বেয়াদবি।'

স্টেশনঘরে বাতি জ্বলছিল বলে তিনি দূর থেকে দেখেছেন। এটা সত্যি না। স্টেশনঘরে বাতি জ্বলছে না। হেদায়েত নিশ্চয়ই বোনের বাড়ি চলে গেছে। মোবারক হোসেন তালা খুলে স্টেশনঘরে ঢুকলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ঘরটা বাইরের মতো হিমশীতল না। উত্তুরে বাতাস তাঁকে কাবু করে ফেলেছিল। বাতাসের হাত থেকে জীবন রক্ষা পেয়েছে। তিনি হারিকেন জ্বালালেন। তাঁর ভয় ছিল হারিকেনে তেল থাকবে না। দেখা গেল তেল আছে। সারা রাত জ্বলার মতোই আছে।

স্টেশনঘরে তাঁর বিছানা আছে। তোশক, লেপ, চাদর, বালিশ। খাওয়া এবং ঘুমানোর ব্যাপারে তার কিছু শৌখিনতা আছে বলে লেপ-তোশক ভালো। বিছানার চাদরটাও ভালো। যদিও মোবারক হোসেনের ধারণা মাঝে মধ্যে হেদায়েত নিজের বিছানা রেখে তার বিছানায় শুয়ে থাকে। কারণ তিনি হঠাৎ হঠাৎ বিছানা চাদরে উৎকট বিড়ির গন্ধ পান। হেদায়েতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে চোখ কপালে তুলে বলেছে—'আমার কি বিছানার অভাব হইছে ?' ব্যাটাকে একদিন হাতেনাতে ধরতে হবে।

মোবারক হোসেন বিছানা করতে শুরু করলেন। শীত যেভাবে পড়ছে অতি দ্রুত লেপের ভেতর ঢুকে যেতে হবে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ঘুম আসবে না—কী আর করা ! নিজের বোকামির উপর তাঁর এখন প্রচণ্ড রাগ লাগছে। রাগ করে ভাত না খাওয়াটা খুব অন্যায় হয়েছে। তারচেয়েও অন্যায় হয়েছে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে আসা। তিনি কেন বাড়ি ছাড়বেন ? এককাপ গরম চা পাওয়া গেলে এই ভয়ঙ্কর রাতটা পার করে দেয়া যেত। মোবারক হোসেন ঠিক করে ফেললেন—এবারের বেতন পেয়েই একটা কেরোসিনের চুলা কিনবেন। একটা সসপেন, চা-পাতা, চিনি। যখন ইচ্ছা হল নিজের চা বানিয়ে খেলেন। মুড়ির টিনে কিছু মুড়ি থাকল। মুড়ির সঙ্গে খেজুর গুড়। শীতের রাতে মুড়ি আর খেজুর গুড় হল বেহেশতি খানা। ডিম থাকলে সসপেনে পানি ফুটিয়ে একটা ডিম সেদ্ধ করে ফেলা। গরম ভাপ ওঠা ডিমসিদ্ধ লবণের ছিটা দিয়ে খাওয়া...উফ ! মোবারক হোসেনের জিভে পানি এসে গেল।

মোবারক হোসেনের খাদ্যসংক্রান্ত চিন্তার সূত্রটি আবারো জট পাকিয়ে গেল। আবারো তার চোখে সবুজ আলো ঝলসে উঠল। এমন কড়া আলো যে আলো নিভলে চারদিকে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকারে ডুবে যায়। হারিকেনের আলো সেই অন্ধকার দূর করতে পারে না। চিকাদের কিচমিচ জাতীয় কিছু শব্দ শুনলেন। শব্দটা আসছে দরজার কাছ থেকে। ছায়ামূর্তির মতো কিছু একটা

দরজায় দাঁড়িয়ে। সবুজ আলোর ঝলক চোখ থেকে না গেলে ছায়ামূর্তির ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। ভূতপ্রেত না তো ? আয়াতুল কুরসিটা পড়া দরকার। সমস্যা হচ্ছে এই সুরাটা তাঁর মুখস্থ নাই। মনোয়ারার আছে। সে কারণে অকারণে আয়াতুল কুরসি পড়ে। কে জানে এখনো হয়তো পড়ছে। খালি বাড়ি মেয়েছেলে একা আছে। ভয় পাবারই কথা। শীতকালে আবার ভূতপ্রেতের আনাগোনা একটু বেশি থাকে।

মোবারক হোসেনের চোখে আলো সয়ে এসেছে। তিনি হাঁ করে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। চিকার কিচকিচ শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। দরজা ধরে একজন মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কিচকিচ শব্দটা সেই করছে। যে দাঁড়িয়ে আছে সে আর যাই হোক ভূতপ্রেত না। ভূতপ্রেত হলে টর্চলাইট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। ভূতের পায়ে বুটজুতা থাকবে না। মাথায় হ্যাটজাতীয় জিনিসও থাকবে না। চোখে রোদচশমাও থাকবে না। মোবারক হোসেন বিড়বিড় করে বললেন, আপনার পরিচয় ?

বলেই মোবারক হোসেন মেয়েটির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর ভয় হতে লাগল মেয়েটি বলে বসবে আমি মানুষ না, অন্য কিছু। এখন তাঁর মনে হচ্ছে ভূতপ্রেতের হাতে টর্চলাইট থাকতেও পারে। এটা বিচিত্র কিছু না। একবার তিনি একটা গল্পে শুনেছেন, রাতে এক ভূত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে সাইকেলের চাকা রাস্তায় ছিল না। রাস্তা থেকে আধা ফুটের মতো উপরে ছিল। ভূত যদি সাইকেল চালাতে পারে তা হলে টর্চলাইটও হাতে নিতে পারে। চোখে রোদচমশাও পরতে পারে। চিকার মতো কিচকিচও করতে পারে।

'আমার নাম এলা। আপনি কি আমার কথা এখন বুঝতে পারছেন ?'

মোবারক হোসেন আবারো বিড়বিড় করে বললেন, জ্বি।

'পরিষ্কার বুঝতে পারছেন ?'

'জ্বি। বাংলা ভাষায় কথা বলছেন বুঝব না কেন ?'

'না, আমি বাংলা ভাষায় কথা বলছি না। আমি আসলে কোনো ভাষাতেই কথা বলছি না। আমার চিন্তাগুলো সরাসরি আপনার মাথায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যে ভাষায় কথা বলছেন সেই ভাষাও আমি বুঝতে পারছি না, তবে আপনার মস্তিষ্কের চিন্তা বুঝতে পারছি।'

মোবারক হোসেন ক্ষীণ স্বরে বললেন, জ্বি আচ্ছা। ধন্যবাদ।

'আপনি এই ক্ষমতাকে দয়া করে কোনো টেলিপ্যাথিক বিদ্যা ভাববেন না। এই ক্ষমতা আমার নেই। আমি এই কাজটার জন্যে ছোট্ট একটি যন্ত্র ব্যবহার করছি। যন্ত্রটার নাম এল জি ৯০০০।'

==========

মোবারক হোসেন আবারো যন্ত্রের মতো বললেন, জ্বি আচ্ছা, ধন্যবাদ।

'আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন ?'

'জ্বি না।'

'আয়াতুল কুরসি ব্যাপারটা কী ? আপনি মনে মনে সারাক্ষণ আয়াতুল কুরসির কথা ভাবছেন। সে কে ?'

'এটা একটা দোয়া। আল্লাহপাকের পাক কালাম। এই দোয়া পাঠ করলে মন থেকে ভয় দূর হয়। জিনভূতের আশ্রয় থেকে আল্লাহপাক মানবজাতিকে রক্ষা করেন।'

'তার মানে আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন ?'

মোবারক হোসেন শুকনো গলায় বললেন, জ্বি না।

'ভয় না পেলে ভয় কাটানোর দোয়া পড়ছেন কেন ?'

মোবারক হোসেন কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তিনি ভয় পাচ্ছেন এবং বেশ ভালো ভয় পাচ্ছেন। মেয়েটা কথা বলছে, কিন্তু তার ঠোঁট নাড়ছে না। ভয় পাবার জন্যে এইটাই যথেষ্ট। তার উপর এমন রূপবতী মেয়েও তিনি তাঁর জীবনে দেখেন নি। পরীস্থানের কোনো পরী না তো ? নির্জন রাতে পরীরা মাঝে মাঝে পুরুষদের ভুলিয়ে ভালিয়ে পরীস্থানে নিয়ে যায়। নানান কুকর্ম করে পুরুষদের ছিবড়া বানিয়ে ছেড়ে দেয়। এই জাতীয় গল্প তিনি অনেক শুনেছেন। তবে পরীরা যুবক এবং সুদর্শন অবিবাহিত ছেলেদেরই নিয়ে যায়। তার মতো আধবুড়োকে নেয় না। তাকে ছিবড়া বানাবার কিছু নেই। তিনি ছিবড়া হয়েই আছেন।

'মোবারক হোসেন।'

'জ্বি।'

'আমি আপনাকে আমাদের দেশে নিতে পারব না। ইচ্ছা থাকলেও পারব না। আমার সেই ক্ষমতা নেই। আমি এসেছি ভবিষ্যৎ পৃথিবী থেকে, পরীস্থান থেকে নয়। আপনাকে ছিবড়া বানানোরও কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

'সিস্টার আপনার কথা শুনে খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক য়্যু।'

'আজকের তারিখ কত দয়া করে বলবেন ?'

'মাঘ মাসের ১২ তারিখ।'

'ইংরেজিটা বলুন, কোন সন ?'

'জানুয়ারি ৩, ১৯৯৭।'

'আমি আসছি ৩০০১ সন থেকে।'

'আসার জন্য ধন্যবাদ। সিস্টার ভিতরে এসে বসুন। দরজা বন্ধ করে দেই। বাইরে অত্যধিক ঠাণ্ডা।'

মেয়েটি ভেতরে এসে দাঁড়াল। মোবারক হোসেন দরজা বন্ধ করলেন। তারপর মনে হল কাজটা ঠিক হয় নি। দরজা খোলা রাখা দরকার ছিল, যাতে প্রয়োজনে খোলা দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারেন। মনোয়ারার সঙ্গে রাগ করে বাড়ি থেকে বের হওয়াটাই ভুল হয়েছে।

দরজা বন্ধ করার পর এলা টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। মোবারক হোসেন চেয়ার এগিয়ে দিলেন। এলা বসতে বসতে বলল, মনোয়ারা কে ? আপনি সারাক্ষণ এই নামটি মনে করছেন।

'জ্বি, আমার স্ত্রী।'

এলা বিস্মিত হয়ে বলল, স্ত্রী ? আপনার স্ত্রী আছে ! কী আশ্চর্য !

মোবারক হোসেন তাকিয়ে আছেন। তার স্ত্রী থাকা এমন কী বিস্ময়কর ঘটনা যে মেয়েটা চোখ কপালে তুলল ! রাস্তায় ভিক্ষা করে যে ফকির, তারও একটা ফকিরনী থাকে। তিনি রেলে কাজ করেন। ছোট চাকরি হলেও সরকারি চাকরি। কোয়ার্টার আছে।

'স্ত্রীর উপর কি কোনো কারণে আপনি বিরক্ত হয়ে আছেন ?'

'ইয়েস সিস্টার। তার উপর রাগ করেছি বলেই স্টেশনে এসে একা একা বসে আছি।'

'খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, এল জি ৯০০০ এই পয়েন্ট নোট করছে। বিজ্ঞান কাউন্সিলে আমরা আপনার কথা বলব। র‍্যানডম স্যাম্পলের আপনি সদস্য হচ্ছেন। আশা করি আপনার বা আপনার স্ত্রীর এই বিষয়ে কোনো আপত্তি হবে না।'

কোনো কিছু না বুঝেই মোবারক হোসেন খুবই বিনীত গলায় বললেন, জ্বি না ম্যাডাম।

'এতক্ষণ সিস্টার বলছিলেন এখন ম্যাডাম বলা শুরু করলেন।'

'সিস্টার ডেকে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। সিস্টার ডাকের মধ্যে হাসপাতালের গন্ধ আছে। হাসপাতাল মানেই অসুখবিসুখ। সেই তুলনায় ম্যাডাম ডাকটা ভালো।'

'স্ত্রীর উপর যখন রাগ করেন তখন আপনি স্টেশনে থাকার জন্যে চলে আসেন। আর যখন স্টেশনে আসেন না তখন স্ত্রীর প্রতি থাকে আপনার ভালবাসা ?'

'জ্বি না। রাগ করেও অনেক সময় বাসায় থাকি। গতকাল রাগ করেছিলাম, তারপরেও বাসায় ছিলাম।'

'কী কারণে রাগ করেছেন বলতে কি কোনো বাধা আছে ?'

'জ্বি না ম্যাডাম। বলতে বাধা নেই।'

'তা হলে বলুন।'

'আজ রাগ করেছি—কারণ, আজ সে ফুলকপি আর সিম একসঙ্গে দিয়ে কৈ মাছের ঝোল রান্না করেছে।'

'এটা কি বড় ধরনের কোনো অন্যায় ?'

'সিম এবং ফুলকপি একসঙ্গে রান্না করা যায়। অনেকে পছন্দ করে। আমি করি না। অনেককে দেখবেন সব তরকারির সঙ্গে ডাল নিচ্ছে। মাছ ভাজা নিয়েছে, তার সঙ্গেও ডাল। মাছ ভাজার এক রকম টেস্ট, ডালের আরেক রকম টেস্ট। দুটাকে কি মেশানো যায় ? তা হলে দুধ দিয়ে আর মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে মাখিয়ে খেলেই তো হত ! আমার পয়েন্টটা কি সিস্টার ধরতে পারলেন ?'

'ধরার চেষ্টা করছি। আপনি আমাকে একেক সময় একেকটা ডাকছেন—কখনো সিস্টার, কখনো ম্যাডাম। আপনি সরাসরি আমাকে এলা ডাকতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

'রাগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। গতকাল কী নিয়ে রাগ করেছেন ?'

'চা দিতে বলেছি। চুমুক দিয়ে দেখি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডাই যদি খাই তা হলে চা খাবার দরকার কী ? শরবত খেলেই হয় ! শুধু ঠাণ্ডা হলেও কথা ছিল। দেখি এলাচের গন্ধ। চা কি পায়েস নাকি যে এলাচ দিতে হবে ? ম্যাডাম ঠিক বলেছি না ?'

'আমি বলতে পারছি না। কারণ, চা নামক বস্তুটি সম্পর্কে আমার ধারণা নেই।'

'শীতের সময় খুবই উপকারী। নেক্সট টাইম আসেন ইনশাল্লাহ আপনাকে চা খাওয়াব। চা-চিনি-দুধ-সব থাকবে।'

'আর কখনো আসব বলে মনে হচ্ছে না। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আর যেসব কারণে রাগারাগি হয় সেটা কি বলবেন ? আপনাদের সব রাগারাগির উৎস কি খাদ্যদ্রব্য ?'

'জ্বি না ম্যাডাম। ওর খাসিলত খারাপ। সবকিছুর মধ্যে উল্টা কথা বলবে। আমি যদি দক্ষিণ বলি—আমার বলাটা যদি তার অপছন্দও হয় দক্ষিণ না বলে তার বলা উচিত পূর্ব বা পশ্চিম—তা বলবে না। সে সোজা বলবে উত্তর।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন বিপরীত ?'

'একশ দশ ভাগ বিপরীত।'

'একশ দশ ভাগ বিপরীত মানে কী ? একশ ভাগের বেশি তো কিছু হতে পারে না।'

'আপা কথার কথা।'

'আপা বলছেন কেন ?'

'আপনাকে বড় বোনের মতো লাগছে এই জন্যে আপা বলেছি। দোষ হয়ে থাকলে ক্ষমা প্রার্থী।'

'দোষ-ত্রুটি না, আপনার কথাবার্তা সামান্য এলোমেলো লাগছে। যাই হোক পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই—আপনার এবং আপনার স্ত্রীর সম্পর্ক তা হলে ভালো না।

'আপনিই বলুন ম্যাডাম ভালো হবার কোনো কারণ আছে ?'

'আপনারা কি একে অন্যকে কোনো গিফট দেন ?'

'একেবারে যে দেই না তা না—ঈদে চান্দে দেই। না দেওয়াই উচিত। তারপরেও দেই এবং তার জন্যে যেসব কথা শুনতে হয়—উফ্ !'

'একটা বলুন শুনি।'

'ঘরের কিচ্ছা বাইরে বলা ঠিক না। তারপরেও জানতে চাচ্ছেন যখন বলি—গত রোজার ঈদে আমি নিজে শখ করে একটা শাড়ি কিনে আনলাম। হালকা সবুজের উপর লাল ফুল। বড় ফুল না, ছোট ছোট ফুল। সে শাড়ি দেখে মুখ বাঁকা করে বলল, 'তোমাকে শাড়ি কে কিনতে বলেছে ! লাল শাড়ি আমি পরি ! আমি লম্বা মানুষ। বহরে ছোট জাকাতের শাড়ি একটা কিনে নিয়ে এসেছ !'

'জাকাতের শাড়ি ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

'গরিব-দুঃখীকে দানের জন্যে দেয়া শাড়ি। শাড়ি বলা ঠিক না। বড় সাইজের গামছা।'

'শেষ প্রশ্ন করি—আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনার এখন তা হলে কোনো ভালবাসা নেই ?'

'ভালবাসা থাকবে কেন বলুন। ভালবাসা থাকলে এই শীতের রাতে আমি স্টেশনে পড়ে থাকি ?'

এলা নামের মহিলা হাতের টর্চলাইট জ্বালিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চারদিক সবুজ আলোয় ছয়লাব করে আবার বাতিটা নেভাল। মোবারক হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, আপনি স্টেশনে থাকতে আসায় আমার জন্যে খুব লাভ হয়েছে।

'কী লাভ ?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আপনার মতামত পেয়েছি। মতামত রেকর্ড করা থাকবে।'

'ম্যাডাম কি এখন চলে যাবেন ?'

'হ্যাঁ চলে যাব।'

'তেমন খাতির-যত্ন করতে পারলাম না, দয়া করে কিছু মনে নেবেন না। নিজগুণে ক্ষমা করবেন।'

'খাতির-যত্ন যথেষ্টই করেছেন এবং আমি আপনার ভদ্রতায় মুগ্ধ। আপনাকে একটা সুসংবাদ দিতে যাচ্ছি। আমি মনে করি এই সুসংবাদ শোনার অধিকার আপনার আছে।'

'জ্বি ম্যাডাম সুসংবাদটা বলেন। দুঃসংবাদ শুনে শুনে কান ঝালাপালা। একটা সুসংবাদ শুনে দেখি কেমন লাগে।'

'আপনার ভালো লাগবে। ভবিষ্যৎ পৃথিবী, যেখানে থেকে আমি এসেছি সেই পৃথিবীতে পুরুষ সম্প্রদায় নেই। শুধুই নারী।'

মোবারক হোসেনের মুখ হা হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে পুরুষ নেই ! শুধুই নারী ! এর মধ্যে সুসংবাদটা কোথায় মোবারক হোসেন ধরতে পারলেন না। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে শুধুই পুরুষ, নারী নেই এটা শুনলেও একটা কথা ছিল।

এলা বলল, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার শতকরা আশি ভাগ ছিল নারী-পুরুষঘটিত সমস্যা। প্রেমঘটিত সমস্যা। একসঙ্গে জীবনযাপনের সমস্যা। ইতিহাসে এমনও আছে যে শুধু একটি নারীর জন্যে একটি নগরী ধ্বংস হয়ে গেছে। আছে না ?

'জ্বি আছে। ট্রয় নগরী।'

'গ্যালাকটিক ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে সংঘটিত অপরাধের শতকরা ৫৩ ভাগ নারীঘটিত।'

মোবারক হোসেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—খাঁটি কথা বলেছেন। ধর্ষণ, এসিড মারা, নাবালিকা হত্যা—পত্রিকা খুললেই এই জিনিস। আল্লাহপাক দয়া করেছেন, এখানে পত্রিকা আসে না।

এলা বলল, মানুষকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে বিজ্ঞান কাউন্সিল একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—পৃথিবীতে পুরুষ এবং মহিলা বলে দু'ধরনের মানবসম্প্রদায় থাকবে না। হয় থাকবে শুধু পুরুষ অথবা শুধু মহিলা। যুক্তিসঙ্গত কারণেই শুধু মহিলা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কারণ মহিলাদের ভেতরই দু'রকমের ক্রমোজোম 'x' এবং 'y' আছে। বুঝতে পারছেন তো ?

কিছু না বুঝেই মোবারক হোসেন বললেন, জ্বি। আপনার কথাবার্তা পানির মতো পরিষ্কার। দুধের শিশুও বুঝবে।

'বংশবৃদ্ধির জন্যে একসময় পুরুষ এবং রমণীর প্রয়োজন ছিল। এখন সেই প্রয়োজন নেই। মানবসম্প্রদায়ের বংশ বৃদ্ধি এখন মাতৃগর্ভে হচ্ছে না। ল্যাবরেটরিতে হচ্ছে। শিশুপালনের যন্ত্রণা থেকেও মানবসম্প্রদায়কে মুক্তি দেয়া হয়েছে।'

'ও।'

এলা বলল, বর্তমান পৃথিবী সুন্দরভাবে চলছে। সমস্যাহীন জীবনযাত্রা। তারপরেও বিজ্ঞান কাউন্সিলে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন ওঠে—পুরুষশূন্য পৃথিবীর এই ধারণায় কোনো ত্রুটি আছে কি না। তখনই তথ্য সংগ্রহের জন্যে প্রাচীন পৃথিবীতে স্কাউট পাঠানো হয়। আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। আমাদের পাঠানো তথ্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে—পুরুষশূন্য পৃথিবী আদর্শ পৃথিবী।

মোবারক হোসেন ভয়ে ভয়ে বললেন, আমরা পুরুষরা কি খারাপ ?

'আলাদাভাবে খারাপ না, তবে পুরুষ যখন মহিলার পাশে থাকে তখন খারাপ।'

সবুজ আলো আবারো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আলো নিভে যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মোবারক হোসেন চোখে কিছু দেখতে পেলেন না। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার পর তিনি দেখলেন—ঘরে আর কেউ নেই। তিনি একা। মোবারক হোসেন সিগারেট ধরালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত হলেন এতক্ষণ যা দেখেছেন সবই চোখের ধান্দা। মন মেজাজ ছিল খারাপ, শীতও পড়েছে ভয়াবহ। সব মিলিয়ে চোখে ধান্দা দেখেছেন। একা একটা স্টেশনে থাকা ঠিক না। আবারো চোখে ধান্দা লাগতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে রাগ করে বের হয়ে এসে আবার ফিরে যাওয়াটাও অত্যন্ত অপমানকর। কিন্তু কী আর করা। মানুষ হয়ে জন্ম নিলে বারবার অপমানের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বাসায় ফিরে গেলেও খাওয়াদাওয়া করা যাবে না। কিছুটা রাগ তাতে দেখানো হবে।

মোবারক হোসেন বাড়িতে ফিরলেন। মনোয়ারা বলামাত্র হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলেন। মনোয়ারা এর মধ্যেই ফুলকপি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল করেছেন। এবং সেই ঝোল এত সুস্বাদু হয়েছে যা বলার না ! রান্নাবান্নার কোনো ইতিহাসের বই থাকলে কৈ মাছের এই ঝোলের কথা স্বর্ণাক্ষরে সেই বইয়ে লেখা

থাকার কথা। মোবারক হোসেনের খুব ইচ্ছা করছে এই কথাটা স্ত্রীকে বলা। শুনলে বেচারি খুশি হবে। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। কারণ মনোয়ারার চোখ লাল এবং ফোলা। সে এতক্ষণ কাঁদছিল। মোবারক হোসেন যতবারই রাগ করে বাইরে চলে যান ততবারই মনোয়ারা কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেন। এই তথ্যটা মোবারক হোসেনের মনে থাকে না। মোবারক হোসেন নরম গলায় বললেন—বউ ভাত খেয়েছ?

মনোয়ারা ভেজা গলায় বললেন, না।

মোবারক হোসেন ভাত মাখিয়ে নলা করে স্ত্রীর মুখের দিকে এগিয়ে বললেন, দেখি হা করো তো।

মনোয়ারা বললেন, ঢং করবে না তো। তোমার ঢং অসহ্য লাগে।

অসহ্য লাগলেও এ ধরনের ঢং মোবারক হোসেন প্রায়ই করেন। এলা নামের মেয়েটাকে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলা হয় নি।

মোবারক হোসেন মনোয়ারার দিকে তাকিয়ে বললেন, কই খাও! ভাত হাতে কতক্ষণ বসে থাকব!

মনোয়ারা বললেন, বুড়ো বয়সে মুখে ভাত! ছিঃ!

ছিঃ বললেও তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখভরতি লজ্জামাখা হাসি।

ebook

ইবুক

বাংলা ও বিশ্ববিখ্যাত বইয়ের জগতে

আপনাকে স্বাগতম

বাংলাদেশ ইবুক লাইব্রেরী

ebook Library of Bangladesh

www.ebooklbd.com

e-mail: ebooklbd@yahoo.com

যে কোন ধরনের বইয়ের

CD/DVD সংগ্রহ করতে

ফোন: +৮৮০১৭৭০৩০০৩৪৮